অন্তঃপুর

অন্তঃপুর

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়



অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৪

প্রকাশক
অমরেন্দ্র দত্ত
অভিজিৎ প্রকাশনী
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

ব্লক ও মুদ্রণ
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২

প্রচ্ছদপট
বিভূতি সেন গুপ্ত

বেঁধেছেন
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা—৯

মূল্য—আড়াই টাকা

॥ উৎসর্গ ॥

কৈশোরসঙ্গী

শ্রীতড়িৎ সরকার

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর

এই মর্তভূমি

দূরের মিছিল

মনে মনে

মুখর লণ্ডন

ছায়া মারীচ

নতুন বাসর

ইভনিং ইন প্যারিস

জন সম্রাট

ব্যালেরিনা

দুর্গতোরণ

প্রদক্ষিণ (যন্ত্রস্থ)

নীলকণ্ঠী (,,)

॥ আবরণ ॥

বেশি ঘুরতে হল না বীরেশকে। নিরুপম খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। ট্রাম থেকে নেমে ডান দিকে কয়েক পা হেঁটেই শোভনাদের বাড়ি পাওয়া গেল।

রাস্তার ওপরে বেশ বড় বাড়ি। কাঠের ফলকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে একটা নামও লেখা রয়েছে। বোধ হয় শোভনার স্বামীর নাম। চারপাশে তাকিয়ে বীরেশ নিশ্চিন্ত হল। যাক সত্যি তাহলে বড়লোকের সঙ্গে শোভনার বিয়ে হয়েছে। দু এক মিনিট ইতস্তত করে সে কলিং-বেল বাজাল। চিনতে পারবে কি না কে জানে। আর চিনতে পারলেও শোভনা এতদিন পর তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে সে ঠিক বুঝতে পারল না।

দরজা খুলে বীরেশের মুখের দিকে শোভনা একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আনন্দে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, বীরুদা তুমি! এতদিন পর? কোত্থেকে এলে?

যাক, বীরেশ হেসে বলল, চিনতে পেরেছ তাহলে। ভয় ছিল যদি না চিনতে পার—

কি যে বল! তোমাকে চিনতে পারব না আমি? তোমার কথা ওকে কত বলেছি!

সর্বনাশ, বীরেশ হালকা সুরে বলল, তোমার স্বামীকে সব বলেছ না কি? তাহলে কোন সাহসে ভেতরে যাই?

ভয় নেই বীরুদা, ও তোমাকে দেখবার জন্যে অধীর হয়ে বসে আছে! হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে শোভনা বলল, কিন্তু আমি কি

অভদ্র দেখছ, তোমাকে এতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এসো, আগে ভেতরে এসো, তারপর কথা হবে। আজ কিন্তু সহজে ছাড়ছি না তোমায়। বীরেশের একটা হাত ধরে শোভনা তাকে টেনে ভেতরে নিয়ে এল।

আধুনিক কায়দায় সুন্দর করে সাজান বসবার ঘর। মেঝেতে দামী কার্পেট। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা কয়েকটা ছবি। এ পাশে রেডিওগ্রাম। ওপাশে পিয়ানো। শোভনার সৌভাগ্যের কথা ভেবে মনে মনে সত্যি খুশি হল বীরেশ।

মূল্যবান সোফায় নড়ে চড়ে বসে শোভনার দিকে তাকিয়ে সে বলল, তুমি তো দেখছি খুব বড়লোক শোভনা!

লজ্জা পেয়ে শোভনা তাড়াতাড়ি বলল, তুমিই বা কম কি? কিন্তু ওসব কথা থাক। কেমন আছ বল? মাসিমা কেমন আছেন?

তিনি আর নেই।

মেসোমশাই?

তিনি আরও আগে গেছেন।

কি আশ্চর্য, আমি কোন খবর পাইনি, মাথা নিচু করে শোভনা বলল, তুমি কি নিজেদের বাড়িতেই আছ এখন?

কোথায় নিজেদের বাড়ি? কবে সে বাড়ি বিক্রি করে গোটা ভারতবর্ষ চষে বেড়ালাম। কলকাতায় মন বসে না আমার। আবার ভাবছি শিগগিরিই বেরিয়ে পড়ব।

এখনও তেমনি পাগল আছ দেখছি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে শোভনা জিজ্ঞেস করল, বিয়ে করেছ তো?

মাথা খারাপ, খুব জোরে হেসে বীরেশ বলল, একবার বিয়ে করতে চেয়ে কি ঘটেছিল মনে নেই?

শোভনাও হেসে বলল, আজও সেকথা মনে করে রেখেছ না কি?

রাখি নি? তাই তো কলিং বেল বাজিয়ে ভাবছিলাম পালিয়ে যাব কি না।

কিন্তু দেখলে তো ভয়ের কোন কারণ নেই। এখন আমি কত ভদ্র হয়ে গেছি। অপমান করে তাড়িয়ে না দিয়ে তোমায় কেমন হাত ধরে খাতির করে ভেতরে নিয়ে এলাম।

নির্বিকারভাবে বীরেশ বলল, তাই তো দেখলাম। আশ্চর্য মেয়েদের স্বভাব।

বীরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল শোভনা। ট্রাম লাইন একটু দূরে হলেও ট্রাম চলাচলের শব্দ পাওয়া যায়। ফাল্গুন আসতে আর দিন কয়েক বাকি আছে কিন্তু এর মধ্যেই জোরে বসন্তের হাওয়া দিয়েছে। শোভনার দক্ষিণ খোলা বাড়ির ঘরে তাজা রোদ উপচে পড়ছে।

শোভনাকে চুপ করে থাকতে দেখে বীরেশ প্রশ্ন করল, তোমার স্বামী বাড়ি নেই?

আছে, মৃদু হেসে শোভনা বলল, একটু বস, আমি তাকে ডেকে আনি, একটু থেমে উঠে দাঁড়িয়ে ও আবার বলল, ঠিক আজই তুমি এলে—

কেন বল তো?

এই ঘর নিজের হাতে পরিষ্কার করব বলে সকাল বেলা নিচে নেমে আসি। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল। ঘর সাজিয়ে ওপরে উঠে যাব ভাবছি এমন সময় তুমি কলিং বেল বাজালে—

বাধা দিয়ে বীরেশ বলল, মনে মনে ডেকেছ বলেই হয়তো আমি আজ এমন করে চলে এলাম। যাও শোভনা এবার তোমার স্বামীকে ডেকে আন।

যাই। বীরুদা, দুপুর বেলা খেয়ে যাও না এখান থেকে?

আজ নয়, একটু ভেবে বীরেশ বলল, আজ একটা বিশেষ দরকারী কাজ আছে। ও হাসল, তেমন করে যদি ডাক আমি আর একদিন এসে তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব নিশ্চয়ই।

শোভনা বলল, শুধু একদিন এলে হবে না, তোমাকে প্রায়ই আসতে হবে। এতদিন পর যখন দেখা পেয়েছি তখন আর উধাও হয়ে যেতে দেব না।

বীরেশ কাব্য করে বলল, বিদায় দিয়েছ যারে নয়ন জলে, এবার ফিরাবে তারে কিসের ছলে?

তোমার মাথা এখনও ঠিক তেমনি খারাপ আছে দেখছি বীরুদা।

শোভনা প্রিয়নাথকে ডাকতে ওপরে চলে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে শোভনা আবার নিচে নেমে এল। আলাপ করিয়ে দেবার দরকার ছিল না, প্রিয়নাথকে দেখেই বীরেশ বুঝে নিল সে কে। তাই তারা ঘরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, মারধোর করবেন না বসতে বলবেন প্রিয়নাথবাবু?

বীরেশের রসিকতা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে প্রিয়নাথ বলল, নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন বীরেশ বাবু। ইচ্ছে থাকলেও মারধোর করতে পারব না কারণ আমরা তো এখন সভ্য জগতের মানুষ।

আবার সোফায় বসে বীরেশ বলল, তবু প্রতিদ্বন্দ্বী কখন কেমন ব্যবহার করে বোঝা কঠিন।

কিন্তু আমি আপনাকে আক্রমণ করতে গেলেই শোভনা আপনার পক্ষ নেবে, হাসিমুখে বীরেশের দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বলল, ওর মুখ থেকে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে না দেখেও আমিও ভালবেসে ফেলেছিলাম—

এদের দুজনের কথাবার্তা শুনে লজ্জা পেয়ে শোভনা বলল, কি

যা তা বকছ—আচ্ছা বীরুদা ছোটমামার সঙ্গে তোমার কি প্রায়ই দেখা হয় ?

নিরুপমের সঙ্গে ? কোথায় ? আগে দেখা হলে আমি কবে তোমার এখানে চলে আসতাম।

কি করছ তুমি আজকাল ? ডাক্তারি পরীক্ষা দেবার আগেই তো বাড়ি থেকে কোথায় পালিয়ে গেলে—তারপর আর পরীক্ষা দিয়েছিলে কি ?

তুমি আর দিতে দিলে কোথায় ? হাসতে হাসতে বীরেশ বলল, তোমরা যতদিন কলকাতায় ছিলে ততদিন এ মুখো হই নি। মা'র চিঠিতে তোমার বাবার বদলীর খবর পেয়ে প্রায় দেড় বছর পর ফিরে এলাম। তখন কি আর পড়াশুনো করা যায় ?

একটু গম্ভীর হয়ে শোভনা বলল, ছি ছি, শুধু শুধু পাগলামি করে পড়াশুনো নষ্ট করলে—

খুব জোরে হেসে বীরেশ প্রিয়নাথকে বলল, শুনুন, শুনুন, মেয়েদের জন্যে সব তুচ্ছ করলে তারা সুযোগ পেলে কেমন কৃপার কথা বলে শুনুন।

প্রিয়নাথ বলল, মেয়েদের স্বভাব অমনি। এ আর নতুন কি !

স্বামীকে তাড়া দিয়ে শোভনা বলল, থাক থাক, তোমাকে আর মেয়েদের স্বভাবের বিশ্লেষণ করতে হবে না—

বীরেশ বাধা দিয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, করেও কোন লাভ নেই, কুল কিনারা পাবেন না।

থাম, শোভনা বলল, খুব পণ্ডিত হয়ে গেছ দেখছি। ওসব বাজে কথা বাদ দিয়ে কি খাবে বল দেখি ?

তুমি যা খাওয়াবে। তোমার দেওয়া কোন জিনিসের এক-টুকরোও আমি ফেলব না।

ঠিক ?

কোন সন্দেহ আছে নাকি ?

তবে ওর সঙ্গে একটু গল্প কর, আমি এখুনি আসছি। উঠে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে শোভনা বলল, চাকরি বাকরি কিছু করছ এখন, না তখনকার মত সব জায়গায় শুধু মেজাজ দেখিয়ে বেড়াচ্ছ ?

কে কাকে বলছে। প্রিয়নাথ বাবুও নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমার মেজাজের পরিচয় পেয়েছেন—কি বলেন ?

তা আর পাইনি—

প্রিয়নাথকে বাধা দিয়ে বীরেশ বলল, চাকরি বাকরি নয়, ওসব আমার দ্বারা হবে না, ব্যবসা করছি। খুব জোরে হেসে সে বলল, যা পাই, খরচ করে শেষ করতে পারি না। দান ধ্যান করে উড়িয়ে দিই। আমার নিজের বলতে গেলে তো খরচই নেই—

তা তো দেখতেই পাচ্ছি, মৃদু হেসে শোভনা বলল, একটা ভাল পাঞ্জাবি কিনতেও ইচ্ছে করে না ? এই রকম জামা-কাপড় পরে রাস্তায় বেরুতে তোমার লজ্জা করে না বীরুদা ?

খুব করে, জোরে হেসে বীরেশ বলল, তুমি কি ভাবছ এমন সাজে আমি ব্যবসা করতে বার হই ?

তাহলে ?

কয়েক মিনিট ইতস্তত করে বীরেশ বলল, ছেঁড়া চটি, নোংরা ধুতি, ময়লা পাঞ্জাবি—এসব আমার তোমার এখানে আসবার বেশ, প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে সে বলল, আমি যখনই তোমার বাড়িতে আসব, এমনি ভিখিরীর বেশেই আসব—

অবাক হয়ে শোভনা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কেন ?

কেন ? বোকা মেয়ে তাও বুঝতে পার না ? শোভনার দামী লাল কার্পেটে ছেঁড়া চটি ঘষে বীরেশ বলল, রাজবেশে তোমার

কাছে গিয়ে শুধু অবহেলা পেয়েছি, কিন্তু ভিখিরীর বেশে এসে কৃপা পাব এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস। এই এখন যেমন পাচ্ছি—

বীরেশের কথার কোন উত্তর না দিয়ে শোভনা তার খাবারের ব্যবস্থা করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে বেরিয়ে যেতেই বীরেশ প্রিয়নাথকে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি কথায় কথায় আপনার স্ত্রীকে জব্দ করব কিন্তু।

যত পারেন করুন। আমি এক কথা বলতে গেলে ও আমাকে দশ কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার মুখের ওপর চট করে কিছু বলতে পারবে না।

বলবে আবার কি, সহজ সুরে বীরেশ বলল, ভিখিরীর বেশে এসেছি, আসবও, আমার কাছে কঠিন হবে কেমন করে?

প্রিয়নাথ বীরেশের দিকে সিগ্রেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, ওকে ভাল করে চিনেছেন দেখছি—

সিগ্রেট? না না, আচ্ছা দিন পকেটে রেখে দিই। পরে খাব। শোভনার সামনে আমার সিগ্রেট খাওয়া চলবে না। আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। পকেট থেকে বিড়ি বের করে প্রিয়নাথের দেশলাই-এ ধরিয়ে নিয়ে বীরেশ বলল, ভিখিরী কি ওই দামী সিগ্রেট খেতে পারে?

হেসে উঠল প্রিয়নাথ, তা বটে।

একটু পরে এক হাতে অনেক রকম খাবারের প্লেট আর এক হাতে জলের গ্লাশ নিয়ে ঘরে ঢুকে বীরেশের দিকে তাকিয়ে শোভনা জিজ্ঞেস করল, বিড়ি কবে থেকে ধরলে বীরুদা?

সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ উত্তর দিল, তোমার বিয়ের দিন থেকে।

গম্ভীর হয়ে শোভনা বলল, খুব হয়েছে। আমার বহু ভাগ্য যে আর কিছু ধরনি।

বীরেশ হেসে বলল, না। তাহলে গরুর গাড়িতে তোমার দোরগোড়ায় এসে মরতে হত। তোমার মত মেয়ের সম্পর্কে কোন মধুর কল্পনাকে আমি যেন কখনও প্রশ্রয় না দিই, সেকথা তুমি তো আমাকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলে। একটু চুপ করে থেকে বীরেশ জিজ্ঞেস করল, মনে নেই ?

না। এখন বাজে না বকে এগুলো খাও দেখি। টিপয়ের ওপর খাবারের প্লেট নামিয়ে রেখে শোভনা বলল, একটু আগে বলেছ, আমার দেওয়া কোন জিনিসের টুকরোও ফেলবে না—

কিন্তু তুমি করেছ কি শোভনা ? এত খাবাব আমি একা খাব কেমন করে ? আসুন প্রিয়নাথ বাবু—

না না, আমরা একটু আগেই খেয়েছি, ওসব তোমাকে একা খেতে হবে বীরুদা—খেতেই হবে।

বেশ খাব, কথা রাখব, কিছুই ফেলব না, হঠাৎ বীরেশ পকেট থেকে রুমাল বের করে সন্দেশ সিঙাড়া বেঁধে টেবিলের ওপর রাখল। প্লেটে রইল শুধু তুটো রসগোল্লা।

ও কি করছ ?

তোমার দেওয়া জিনিস ফেলতে পারব না, ওগুলো বাড়ি গিয়ে তুদিন ধরে খাব। একবারে এত খেয়ে কি তোমার বাড়িতে বসে মরব ?

শোভনা হেসে বলল, পাগল! তোমার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঠিক নিজে খাবে তো না চাকরকে দিয়ে দেবে ?

তোমার দেওয়া জিনিস প্রাণ ধরে চাকরকে দিতে পারব না, নিজেই খাব। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে শোভনা বলল, তোমার রান্নাবান্না চাকর করে নাকি ?

চাকর ছাড়া আর কে করবে ?

কেমন রাঁধে ?

চাকররা যেমন রেঁধে থাকে।

তোমার খুব অসুবিধা হয়, না ? শোভনা স্তিমিত স্বরে বলল, কোন কাজ তো কোনদিন নিজে করতে পারতে না। মাসিমা জল গড়িয়ে না দিলে এক গ্লাশ জলও খেতে পারতে না—

এখন সব পারি, রসগোল্লা দুটো শেষ করে বীরেশ বলল, কারুর ওপর নির্ভর করবার সামান্য ইচ্ছে আর নেই।

মাসিমা জোর করে তোমার একটা বিয়ে দিলে সবচেয়ে ভাল হত।

কথা না বলে বীরেশ মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ করল, হুঁ ! অর্থাৎ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে কোন কাজ করানোর ক্ষমতা এ-পৃথিবীতে কারুর নেই।

সেদিন অমনি টুকরো আলোচনা ছাড়া আর বেশি কথা হল না। আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আবার আসবে কথা দিয়ে খাবার বাঁধা রুমাল হাতে ঝুলিয়ে বীরেশ বিদায় নিল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল শোভনা। আর তার চোখ দুটো অকারণে বুঝি ছল ছল করে উঠল।

স্ত্রীর ভাবান্তর লক্ষ না করে প্রিয়নাথ হেসে বলল, খাঁটি লোক তোমার এই বীরুদা। প্রেমের জন্যে সব কিছু তুচ্ছ করতে পারে।

মুখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে শোভনা বলল, ওর সঙ্গে আমার দেখা না হলেই বোধ হয় ভাল হত। কে ভেবেছিল, ছেলেমানুষের মত পাগলামি করে ও এমন ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াবে—

প্রিয়নাথ আবার বলল, খাঁটি লোক এমনই হয়।

কী আরামে মানুষ হয়েছে ছেলেবেলায়। মাসিমা ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। গাড়ি বাড়ি—কোন কিছুর অভাব ছিল না ওদের। ম্লান চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে শোভনা বহুবার বলা কথাটা আবার বলল, আমাদের বাড়ির ছেলের মতো আসত যেত, আমিও ওর সঙ্গে সেইভাবে মিশতাম, একটু চুপ করে থেকে ও বলল, বিশেষ কিছুই বলে নি আমাকে, সামান্য আভাস দিয়েছিল—

প্রিয়নাথ হেসে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তুমি তা শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠেছিলে কেন?

বাড়ির লোকের মতো যাকে দেখি, তার সঙ্গে ও-সম্পর্কের কথা ভাবব কেমন করে? তাই যা মুখে এলো তা বলে ওকে আমার সামনে থেকে চলে যেতে বললাম, শূন্য চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে শোভনা বলল, আশ্চর্য, এ-ব্যাপারটাকে ও এত বড় করে নেবে তা তো ভাবতে পারিনি। সত্যি সব ছেড়ে আমার সামনে থেকে ও একেবারে চলে গেল—তারপর আজ আবার ওকে দেখলাম—

প্রিয়নাথ বলল, কিন্তু তোমার বীরুদার কোন দুঃখ আছে বলে মনে হল না, উনি তো বেশ আনন্দে আছেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল শোভনা, ওকে যদি তুমি আগে দেখতে! সেই লোক কী হয়েছে। আমার জন্যে এমন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে এটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। তাই বলছিলাম, ওর সঙ্গে আমার দেখা না হলেই যেন ভাল হত।

প্রিয়নাথ বলল, এসব কথা ওকে কিন্তু কখনও জানতে দিও না। উনি যেমন মানুষ, এসব শুনলে তোমার সঙ্গে বোধহয় আর কখনও দেখা করতে আসবেন না।

আমি জানি, কয়েক মিনিট ইতস্তত করে শোভনা বলল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

কি ?

বীরুদাকে আমি যখন খুশি নেমন্তন্ন করব, মাঝে মাঝে এখানে থাকতে বলব, তুমি কিছু মনে করতে পারবে না।

শোভনার একটা হাত ধরে প্রিয়নাথ বলল, একথা আমাকে এমন করে জিজ্ঞেস করছ কেন শোভা ? এই পনের বছরেও তুমি কি আমাকে চিনলে না ? তোমার কোন্ কাজে কবে আমি বাধা দিয়েছি ?

জানি, তবু, স্বামীর হাত শক্ত করে ধরে শোভনা বলল, কি জানি কেন একথা জিজ্ঞেস করলাম।

শনিবার সন্ধ্যেবেলা নানারকম রান্না করে শোভনা বীরেশের জন্যে পথ চেয়ে বসে রইল কিন্তু রাত বারোটা বেজে গেল তবু সে এসে পৌঁছল না।

বীরেশ শোভনাদের বাড়ি আবার এলো পরের রবিবার দুপুর দুটোয়। তেমনি বেশ ভাব। পাঞ্জাবিটা আরও ময়লা হয়েছে। চটিটাও বোধহয় আর একটু ছিঁড়েছে। শোভনা খাওয়া দাওয়া সেরে বন বন করে পাখা চালিয়ে শুয়ে ছিল। বীরেশ এসেছে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে কচলাতে নিচে নেমে এল।

খুব লোক যা হোক ! কি ব্যাপার তোমার ? সেদিন হাঁ করে রাত বারটা অবধি না খেয়ে তোমার জন্যে বসে রইলাম, এলে না কেন ?

বীরেশ কপালের ঘাম মুছে উত্তর দিল, শরীরটা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল, না হলে নিশ্চয়ই আসতাম। তোমার আহ্বান আমি কি অবহেলা করতে পারি ?

সঙ্গে সঙ্গে শোভনা বলল, আজ রাত্তিরে খেয়ে যেতে হবে কিন্তু—

না, আজ বেশিক্ষণ বসব না। ব্যবসার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে সাড়ে পাঁচটার সময় দেখা করতে হবে, বীরেশ হেসে বলল, আমাকে খাওয়াবার জন্যে তুমি অত ব্যস্ত কেন? এই তো সেদিন তোমার দেওয়া খাবার বাড়ি বয়ে নিয়ে গিয়ে দুদিন ধরে খেলাম—

থাক থাক, খুব হয়েছে, ভারী তো খাবার। ঘরের দুটো পাখা শোভনা আরও জোরে চালিয়ে দিয়ে বলল, আজ বাড়িতে খাবার করেছি, তোমার সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ারে দিয়ে দেব। তোমার চাকরের রান্নার চেয়ে ভাল হয়েছে বলে মনে হয়—

কি যে বল, বিড়ি ধরাতে ধরাতে বীরেশ বলল, যার তার সঙ্গে আর কখনও আমার সামনে নিজের তুলনা কর না শোভনা—

ও বাবা, এখনও সমান দরদ আছে দেখছি।

প্রিয়নাথ বাবু কোথায়?

ওপরে ঘুমোচ্ছে।

তাকে ডাকবে না?

কি দরকার? শোভনা হাসল, তুমি তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, শুধু শুধু ওর ঘুম ভাঙ্গিয়ে কি লাভ?

জোরে হেসে বীরেশ বলল, ঘুম ভাঙ্গালেও আমার কোন লোকসান নেই, কারণ ওঁর আড়ালে তোমাকে এখন কিছু দেবার ইচ্ছে, সামর্থ্য, উপায়—কোনটাই আমার নেই। তোমার বাড়িতে তোমার কাছ থেকে আমি এখন শুধু কৃপা নিতে আসি—কিছু দিতে আসি না।

মোটে তো দু দিন এলে। আরও বেশি আসতে পার না? কত কৃপা চাও, আমিও দেখিয়ে দেব!

কাছে থাকলে নিশ্চয়ই আরও বেশি আসতাম। ভরা সংসারে

তুমি সুখে আছ, এ দেখা আমারও কম সুখ নয়। কিন্তু আমি যে অনেক দূরে থাকি—

থাম, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শোভনা বলল, কি বোঝ তুমি সুখের? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলে নিল, সেদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি, তুমি কোথায় থাক বীরুদা ?

অনেক দূরে—হাওড়ায়।

হাওড়ার কোথায় ?

আটত্রিশের ডি পঞ্চানন লেন। কেন বল তো ? তুমি বেড়াতে যাবে নাকি সেখানে ?

যদি যাই ক্ষতি কি ? তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল বলে শনিবার আসতে পারলে না, আমাকে একটা পোস্টকার্ড লিখে জানালে আমি গিয়ে তোমাকে দেখে আসতে পারতাম।

কিন্তু আমি কি দেখাব তোমাকে ? আমার তো তোমার মত এমন ভরা সংসার নেই—

আমি তোমাকে দেখতেই যাব বীরুদা।

চাপা হাসি হেসে বীরেশ বলল, নিজের অধিকারের কথা ভুলে যেও না শোভনা। আমাকে দেখতে যাওয়ার তোমার আর কোন অধিকার নেই।

মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে শোভনা বলল, আমি একা যাব না বীরুদা, গেলে ওকে সঙ্গে নিয়েই যাব।

সেটা আবার আমার নাও সহ্য হতে পারে। কাজেই ওকথা বাদ দাও। যদি সত্যি চাও আমিই আসব তোমার এখানে।

আবার কবে আসবে বল ?

যেদিন তুমি আসতে বলবে।

শোভনা হাসল, আমি যদি রোজ আসতে বলি ?

কাছাকাছি থাকলে নিশ্চয়ই আসতাম। হাওড়া থেকে বালিগঞ্জে রোজ আসা কি সম্ভব ?

তাহলে শনিবার কিংবা রবিবার—সপ্তাহে অন্তত একবার তোমাকে আসতেই হবে।

চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়. আসতেই হবে।

বীরেশ বলল, শরীরের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, প্রত্যেক সপ্তাহে বাসে ট্রামে এতদূর আসা—

বাসে ট্রামে কেন, ট্যাক্সিতে আসবে ?

তোমার জন্যে অত পয়সা খরচ করব কেন ? রাজবেশে তোমার সঙ্গে দেখা করবার দিন আমার শেষ হয়ে গেছে।

তোমাকে পয়সা খরচ করতে হবে না, একটু চুপ করে থেকে শোভনা বলল, আমি তোমাকে ট্যাক্সি ভাড়া দেব—

বীরেশ হাত বাড়িয়ে বলল, দাও। তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে আমি ঠিক ট্যাক্সি করেই আসব, শোভনার মুখের দিকে তাকিয়ে ও হেসে বলল, তোমার জন্যে সারা জীবন ধরে অনেক কষ্ট ভোগ করেছি কিন্তু বাসে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে তোমাকে নিয়ম করে দেখতে আসার কষ্ট এই বয়সে বোধহয় সহ্য করতে পারব না। তাই তো সেদিন আসতে পারিনি।

ঠিক নেবে তুমি ট্যাক্সি ভাড়া ?

তোমার দেওয়া সব কিছুই আমি মাথায় করে নেব কিন্তু তোমাকে কিছু দিতে পারব না—সেকথা তো আগেই বলেছি।

হাসিমুখে শোভনা বলল, কিছু দেবার দরকার নেই। শুধু দেখা করলেই খুশি হব।

আর ভাবনা কি, শরীর খারাপ থাকলেও তোমার দেওয়া টাকায়

ট্যাক্সি চড়ে তোমারই সঙ্গে দেখা করতে আসব, শব্দ করে হেসে বীরেশ বলল, এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে কি!

একটা দশটাকার নোট বুক পকেটে রেখে শোভনার তৈরী খাবার ভরা টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ঝুলিয়ে আবার আগামী রবিবার নিশ্চয় আসবে কথা দিয়ে সেদিন সাড়ে পাঁচটার আগেই বীরেশ চলে গেল।

রবিবারে একের পর এক বহু ট্যাক্সি শোভনার বাড়ির পাশ দিয়ে গেল কিন্তু কোন ট্যাক্সি থেকে বীরেশ নামল না।

কি হল আজ তার? খুব বেশি শরীর খারাপ হল নাকি? তা ছাড়া বীরেশের না আসবার আর তো কারণ নেই। তাকে ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দিয়েছে শোভনা!

অত বিচলিত হচ্ছ কেন? প্রিয়নাথ সস্নেহে বলল, হয় তো কোন বিশেষ কাজে আটকে পড়েছেন তাই শেষ অবধি আসতে পারলেন না।

আমার মনে হয় ভীষণ অসুখ করেছে বীরুদার—

অসুখ করবে কেন? এর আগেরবারও তো উনি আসব বলে আসেন নি।

ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়ার কথাটা স্বামীর কাছে গোপন করে শোভনা বলল, ঠিক অসুখ করেছে বীরুদার। কি করি বলত? এত দূরে থাকে যে সহজে খোঁজ নেবারও উপায় নেই।

প্রিয়নাথ বলল, দু চারদিন দেখা যাক না, তারপর না হয় খোঁজ নেবার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

দিন রাতের অস্বস্তির মধ্যে দশ বারো দিন কেটে গেল তবু বীরেশের দেখা নেই।

আর প্রতীক্ষা করতে না পেরে দিশাহারা হয়ে শোভনা প্রিয়নাথকে বলল, ওগো তুমি এখুনি একটা চিঠি লেখ বীরুদাকে। আমাদের আগেই ওকে লেখা উচিত ছিল। শুধু চাকরের ভরসায় থাকে! লোকটার একটা সাংঘাতিক কিছু হয়ে গেল কি না কে জানে—।

শোভনার কাছ থেকে ঠিকানা জেনে সেইদিন এক্সপ্রেস্ চিঠি বীরেশকে লিখে দিল প্রিয়নাথ। সে নিজেই যেতে চেয়েছিল কিন্তু পাছে ট্যাক্সিভাড়া দেবার কথা প্রকাশ হয়ে যায় তাই শোভনা তাকে যেতে দেয়নি।

কিন্তু কোন উত্তর নেই। শোভনা অধীর হয়ে উঠল। আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। বীরেশের খবর নিতেই হবে। রবিবার সকালে ওদের ড্রাইভার ছুটি নিয়েছিল তাই প্রিয়নাথকে সঙ্গে নিয়ে বড় রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি নিল শোভনা। বীরেশ না চাইলে হবে কি, এখুনি তাকে আটত্রিশের ডি পঞ্চানন লেনে নিজে গিয়ে জানতে হবে কি ব্যাপার। সারা পথ মুখ ভার করে রইল শোভনা। প্রিয়নাথের সঙ্গে একটি কথাও বলল না।

হাওড়ায় পৌঁছতে বেশ সময় লাগল। পঞ্চানন লেন খুঁজে পেতেও দেরি হল খুব। ছোট স্যাঁতসেঁতে গলি। ভেতরে ট্যাক্সি ঢুকবে না।

গলির মোড়ে ট্যাক্সি থামাল ড্রাইভার। ভাড়া চুকিয়ে প্রিয়নাথ আর শোভনা নম্বর খুঁজতে সামনে এগিয়ে গেল। সেই বড়লোকের একমাত্র দুলাল এমন জায়গায় এসে বাসা বেঁধেছে! বুক-জ্বালা-করা দীর্ঘনিশ্বাস কোনরকমে চেপে গেল শোভনা। যেমন করে হোক এ গলি থেকে বীরুদাকে নিয়ে যেতে হবে। তার নিজের বাড়িতে একটা ঘর একেবারে খালি পড়ে

আছে। বীরুদা গিয়ে থাকবে সেখানে। এই গলিতে ওর মত লোক থাকতে পারে নাকি!

প্রিয়নাথ আঙুল দেখিয়ে বলল, এই তো আটত্রিশের ডি—

একতলা বাড়ির একাংশ। খিড়কির দরজার ওপরে নম্বর লেখা রয়েছে। দুপাশে বিপুল ধৈর্য নিয়ে বসে আছে দুজন কাবুলি। শোভনা আর প্রিয়নাথের দিকে চোখ পিট পিট করে তারা তাকিয়ে রইল।

তাদের দিকে না তাকিয়ে শোভনা ইসারায় প্রিয়নাথকে কড়া নাড়তে বলল।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর ভেতর থেকে মেয়ের গলা শোনা গেল, সেই থেকে বলছি বাবু বাড়ি নেই, কলকাতার বাইরে গেছেন তবু কেন তোমরা সকাল থেকে বিরক্ত করছ?

এ আবার কার গলা? শোভনা প্রিয়নাথের পাশে এসে বলল, কাদের সঙ্গে থাকে বীরুদা? ওগো তুমি একবার ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাক না—

বীরেশ বাবু, বীরেশ বাবু বাড়ি আছেন?

কে? সেই মেয়ের গলা শোনা গেল আবার। খিল খোলবার শব্দ হল। তারপর একটি বউ দরজা সামান্য ফাঁক করে প্রশ্ন করল, কাকে চান?

বীরেশ বাবু কি এই বাড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

শোভনা এগিয়ে এসে বিরক্ত হয়ে বলল, বলুন বালিগঞ্জ থেকে শোভনা এসেছে—

ওমা আপনি! কী সৌভাগ্য! বউটি কাবুলিদের দিকে তাকিয়ে সন্তর্পণে দরজা আরও ফাঁক করে বলল, আসুন, ভেতরে আসুন—

কই, বীরুদা কই ?

সশব্দে তাড়াতাড়ি আবার দরজায় খিল তুলে সাধারণ সাদা মিলের সাড়ি পরা শীর্ণ বউটি বলল, পাওনাদারের ভয়ে ভোর চারটেয় উঠে কোথায় সরে পড়েছেন।

কার পাওনাদার ? এ রোগা বউটি কে ? সে কার কথাই বা বলছে শোভনা কিছু বুঝতে পারল না।

আবার কার ? আপনি তো সবই জানেন ভাই। আহা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বউটি বলল, বসুন।

একটা ভাঙা তক্তপোষ আর দুটো ধসে পড়া বেতের মোড়া। লোনা-ধরা দেয়াল-ঘেরা অন্ধকার ঘর।

চারপাশে একদৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে শোভনা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে ?

খিল খিল করে হেসে বউটি বলল, ওমা আমাকেও আপনি চিনতে পারলেন না ভাই—

তার দেখা বীরেশের যত আত্মীয়া আছে তাদের প্রত্যেকের চেহারা মনে করবার চেষ্টা করল শোভনা। কিন্তু না, এ মুখ সে এর আগে কখনও দেখে নি।

তার বিমূঢ় ভাব দেখে হাসি থামিয়ে বউটি বলল, আমি মিনতি, আপনার সতীন।

কথা শুনে শোভনা চমকে উঠল। কি বলছে এ ? তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। এ কথা কি বিশ্বাস করা যায় !

বোধহয় তার মনের ভাব বুঝতে পেরে মিনতি বলল, চেহারা দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না বুঝি ? বিশ্বাস করুন ভাই, বিয়ের সময় এমন প্যাকাটির মত আমি ছিলাম না। না খেতে পেয়ে ছিরি খুলেছে। আর পারি না, কবে যে চাকরি হবে ওঁর ! জানেন তো সেই তেল কোম্পানির চাকরিটা গেছে—

বীরেশের সম্বন্ধে আর কিছু শোনবার এতটুকু উৎসাহ ছিল না শোভনার। সে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলাম। আজ তাহলে আমরা আসি—

ওমা, এর মধ্যে যাবেন কি ভাই? এই তো এলেন। বসুন মেয়েদের ডাকি। আপনার পাঠান খাবার খেয়ে ওরা তো আপনাকে দেখবার জন্যে হেদিয়ে মরছে। ওর বাপকে এত বলি আমাদের সকলকে একদিন আপনার ওখানে নিয়ে যেতে তা উনি বলেন, আমি কখন কোথা থেকে সেখানে যাই ঠিক নেই, তোমাদের অতদূরে নিয়ে যাওয়ার অনেক হাঙ্গাম—

কথার মাঝেই মিনতি চিৎকার করে ডাকল, এই পিকু টিকু মিকু শিগগির, তোদের শোভনা মাসি এসেছে দেখবি আয়—

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে তিনটি ছোট মেয়ে হুড়মুড় করে এসে ঢুকল। তিনজনের গায়ে সস্তা ছিটের একই রকম ফ্রক।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? প্রণাম কর, শোভনার দিকে তাকিয়ে মিনতি বলল, এই তিন মেয়ে আমার। ওঁর দিকের আত্মীয় বলতে তো আর কেউ নেই, তাই আপনার কথা শুনে কেবলই আপনার বাড়ি যাবার জন্যে বায়না ধরে—

সবচেয়ে ছোট মেয়েটি এক কোণায় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে শোভনার চোখ পড়তেই সে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠল, আমাকে তুমি জুতো কিনে দাও নি, আমাকে ওষুধ কিনে দাও নি— কিচ্ছু দাও নি। আমাকে তুমি ভালবাস না—

এই মিকু থাম, তাকে তাড়া দিয়ে মিনতি ম্লান হেসে শোভনাকে বলল, সংসার খরচের জন্যে আপনি সেদিন ওকে যে দশটাকা দিয়েছিলেন তা থেকে বড় মেয়ের ওষুধ আর মেজ মেয়ের জুতো কেনা

হয়েছে। ও বেচারি কিছু পায় নি বলে আপনার ওপর অভিমান করেছে।

সেই ছোট মেয়েটি আবার বলল, আমার জুতো একেবারে ছিঁড়ে গেছে, কবে তুমি আমাকে জুতো কিনে দেবে শোভনা মাসি?

মিনতি চোখ রাঙিয়ে তাকে কিছু বলবার আগেই ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শোভনা বলল, এই নাও খুকি, এই টাকা দিয়ে তুমি জুতো কিনে নিও—

প্রিয়নাথ এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এইবার শোভনার হাত থেকে আস্তে নোটটা টেনে নিয়ে মেয়েটিকে বলল, আমি সুন্দর জুতো কিনে রাখব, তোমার বাবাকে বলো কাল আমাদের বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে—কেমন খুকু?

আমার নাম খুকু নয়, মিকু।

রাস্তায় নেমে শোভনা এতক্ষণের জমা করা জ্বালা ঢেলে দিল, কেন তুমি আমাকে ওই মেয়েটার জুতো কেনবার টাকা দিতে দিলে না? তুমি কি মনে কর আর কোনদিন ওর বাপ আমার বাড়িতে ঢুকতে সাহস পাবে?

না, প্রিয়নাথ হেসে বলল, তাই তাঁর মেয়েকে তুমি এমন করে ভিক্ষে দিয়ে যেতে পার না—

লোকটা কি আমার কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে বাকি রেখেছে ভাব? ট্যাক্সি করে আমাকে দেখতে যাবে বলে টাকা নিয়ে মেয়েদের ওষুধ জুতো কিনেছে—এতটুকু আত্মসম্মান জ্ঞান নেই!

প্রিয়নাথ বলল, মিথ্যা আত্মসম্মান জ্ঞান আছে বলেই তো তিনি প্রেম দিয়ে তাঁর দারিদ্র ঢাকতে চেয়েছিলেন। আর তা না করলে তুমিও তাঁকে হয়তো আবার আসবার জন্যে অনুরোধ করতে পারতে না।



থাম তুমি। উঃ, লোকটা যে এতদূর ছোটলোক হয়ে গেছে ভাবতে পারিনি। ইতর অভদ্র জোচ্চোর—

শোভনার কথা কানে না তুলে একটু দূরে একটা ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বলল, চল, ওই ট্যাক্সিটা নিয়ে ফেরা যাক।

উত্তেজিত স্বরে শোভনা বলল, না, বাসেই চল, দ্রুত পায়ে সে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

পিছনে প্রিয়নাথ।

২৭শে জানুয়ারী : ১৯৫৭
রবিবার বিকেল : কলিকাতা

॥ দৈন্য ॥

কমাণ্ডার দত্তরায়ের কোয়ার্টার্সে কখনও বোধ হয় অন্ধকার হয় না।

সারা রাত চারপাশে অসংখ্য আলো জ্বলে। ফিকে হলুদ আভা লুটোপুটি খায় প্রত্যেক ঘরে। জানলার গা ঘেঁষে সার্চ লাইটের আলো সরে সরে যায়। আচমকা থেমে থেমে জাহাজের বাঁশি বাজে। অনেকক্ষণ।

তখন ঘুমন্ত শমিতার মুখে সার্থক জীবনের এক আশ্চর্য রঙ লেগে থাকে। বিলাস আর ঐশ্বর্য এক সঙ্গে মিশে জোরালো গন্ধ ছড়ায় কমাণ্ডার দত্তরায়ের দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর থেকে।

সেই গন্ধের কেমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে। ঘুমন্ত শমিতার দেহ গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে কাছে চলে আসে দত্তরায়ের। কিন্তু একপাশে কাৎ হয়ে বালিশে ঘাড় গুঁজে থাকে দত্তরায়। নড়ে না। শুধু অস্বাভাবিক শব্দ করে মুখ দিয়ে।

দিনের বেলা আলোর ধমকে চোখ ঝলসে যায় এখানে। এত আলো যে দু-একটা জানলা দরজা ভেজিয়ে কড়া রোদের তাপ বাঁচাতে হয়।

বয়-বেয়ারার হাতের দোলায় টুং-টাং শব্দ করে বিরাট আলোর ঝাড়। এক কণা ধুলো থাকে না কোথাও। সন্ধ্যেবেলা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক ফুৎকারে দপ করে এক সঙ্গে সব আলোগুলি নিভে গেল। শমিতার মুখের ওপর মিশকালো

পশুর রঙের মতো এক মুঠো অন্ধকার ছুঁড়ে দিয়ে গেল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

তিক্ত অবসাদে শমিতা যেন আছাড় খেয়ে পড়ল। বিকট অন্ধকার ছাড়া এখন বোধহয় আর কিছু নেই।

জাহাজের বাঁশি-বাজা রাত যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেয় শমিতার। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। পা দিয়ে ঠেলে সাড়ি দূরে সরিয়ে দেয়। বালিশ উঁচু করে খাটে ঠেস দিয়ে হাঁপায়। গলা শুকিয়ে গেছে। আস্তে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ও জলের গ্লাস তুলে নেয়। খালি। কখন জল খেয়েছে মনে পড়ে না। গ্লাসটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে।

স্বামীকে জাগাতে চায়। বার দু-এক ঠেলা মারে। অনেক রাতে ফিরেছে দত্তরায়। ককটেইলের ঘোর কাটেনি এখনও। শমিতার ধাক্কা খেয়ে বিরক্ত হয়। সাড়া দেয় না।

এখন রাত কত কে জানে।

সকাল বেলা জ্বর একটু বাড়ল। আরও বাড়বে। তারপর ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে। আর উঠতে পারবে না শমিতা। মরে পড়ে থাকবে। দত্তরায় খবর পাবে অনেক পরে। তবু জাহাজের বাঁশি বাজবে। কেউ শুনবে। কেউ শুনবে না।

বেরোবার আগে স্ত্রীর কপালে হাত দিয়ে শরীরের তাপ পরীক্ষা করল দত্তরায়, কর্নেল ঘোষালকে খবর দিয়েছি। উনি এখুনিই আসবেন।

যন্ত্রের মতো শমিতা বলে উঠল, দরকার নেই।

তাকে আদর করে দত্তরায় বলল, শুধু শুধু কষ্ট পাবে কেন? কর্নেল ঘোষালের চেয়ে বড় ডাক্তার আর কেউ নেই। উনি এলেই তোমার অসুখ সেরে যাবে। আমি ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে উনি চলে আসেন।

তুমি আজ বেরিও না।

দত্তরায় হাসল, তিন-তিনটে জাহাজ এসেছে। কী কাজের চাপ এখন বুঝতেই তো পার, কঠিন দায়িত্ব বহন করবার গর্বে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কমাণ্ডারের।

তবে আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

আবার হাসল দত্তরায়, ক্যাপ্টেন কোঙারের ওখানে পার্টি আছে। অফিস থেকে সোজা চলে যেতে হবে সেখানে, স্ত্রীর চুলে আঙুল চালিয়ে একটু চুপ করে থেকে দত্তরায় বলল, আজ থেকে তোমার জন্যে রাতের নার্সের ব্যবস্থাও করি, কি বল ?

দরকার নেই, নীরস স্বর কাঁপল শমিতার।

দত্তরায় ঘড়ি দেখল। সময় হয়ে গেছে। এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। নার্সকে ইসারায় ডেকে উপদেশ দিল সব সময় শমিতার কাছে থাকবার। পরিচর্যার যেন কোন ত্রুটি না হয়। পাকা নার্স। এসব কথা বলবার কোন দরকার নেই। তবু বলল দত্তরায়।

ঠিক এই সময় ওরা চলে গেল, কর্কশ গলার স্বর দত্তরায়ের, এখন ওরা থাকলে কত সুবিধা হত তোমার !

নাম করবার দরকার হয় না। শমিতা এক মুহূর্তে বুঝতে পারে কাদের কথা বলছে তার স্বামী।

কিন্তু কোন সুবিধা হত না ওরা থাকলে। আরও যন্ত্রণা হত। আরও জ্বর বাড়ত। ওদের আর সহ্য করতে পারত না শমিতা। কিছুতেই না।

না না, নিস্তেজ স্বরে শমিতা বলে উঠল, ওরা চলে গিয়ে ভাল হয়েছে। ওদের কথা বোল না আমায়।

কথা শুনে ভ্রূকুটি করে দত্তরায়। আর একবার ঘড়ি দেখে। উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, খুব বিরক্ত করত বুঝি তোমায় ?

ভী—ষ—ণ, টেনে টেনে শমিতা বলে। হাঁপায়। আর কথা বলতে চায় না। পাশ ফিরে শোয়।

কই, আমায় কিছু বলনি তো? তাহলে আরও আগে বিদায় করে দিতাম।

চোখে-মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে ভারী জুতোর শব্দ করতে করতে কাজে বেরিয়ে যায় কমাণ্ডার দত্তরায়। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে নিচেই অপেক্ষা করছে।

শমিতা মোটরের শব্দ শোনে। আবার অনেক রাতে ফিরে আসবে। টলবে। স্বর জড়িয়ে যাবে। যন্ত্রের মতো দু-একটা প্রশ্ন করে খবর নেবে শমিতার শরীরের। তারপর পড়ে থাকবে তার পাশে। মড়ার মতো। ভোর অবধি।

রোজই এমন হয়।

খুব ভোরে ওরা এসেছিল।

বাইরের একটিও আলো নেভানো হয়নি তখনও। রাতের প্রহরীও চলে যায়নি। অন্য আর একজন সবে এসে দাঁড়িয়েছে।

যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। শুধু উত্তর পাওয়ার অপেক্ষা। শমিতার চিঠি পেয়েই চলে এসেছে। কদিন থাকবে ঠিক নেই। কবে চাকরি পাবে তাও বলা যায় না।

শমিতাকেই চিঠি লিখেছিল বিকাশ। কি একটা কাজ করত জামসেদপুরের কারখানায়। চাকরি গেছে হঠাৎ। খুব অসুবিধার মধ্যে আছে অনিলা আর সে। যদিও শমিতা ওদের কাউকেই দেখেনি, ওদের কথা কখনও শুনেছে কিনা তাও বিকাশ জানে না। তবুও কমাণ্ডার দত্তরায় ওর দাদা আর সম্পর্কটা খুব বেশি দূরেরও নয়। তাই কলকাতায় এসে শমিতার বাড়িতে কিছুদিন থেকে ও একটা চাকরির চেষ্টা করতে চায়। যদি দয়া করে শমিতা

কলকাতায় আসবার অনুমতি দেয়, তাহলে বলা বাহুল্য, বিশেষ উপকার করা হয় ওদের।

আপত্তি করেছিল দত্তরায়, কি দরকার ওসব দায় ঘাড়ে নেবার? তোমারই অসুবিধা হবে।

চিঠিটা উল্টেপাল্টে আর একবার ওপর-ওপর পড়ে শমিতা থেমে থেমে বলেছিল, আমাকে লিখেছে অত করে! আমি বলি, আসতে যখন চেয়েছে, থেকে যাক না এখানে কয়েক দিন---

কয়েক দিন? অবজ্ঞার রেশ ফুটে উঠল দত্তরায়েব কথায়, চাকরি জোগাড় করা সোজা নাকি ওসব লোকের পক্ষে? কতদিন থাকবে কোন ঠিক নেই।

তবু—

তা ছাড়া ওই রকম দুঃস্থ আত্মীয়কে আমি কারোর কাছে পাঠাতে পারব না—আমার পরিচয়ও দিতে দেব না।

ওদের কাছে নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কথায় একটু জোর দিল শমিতা, তোমার পরিচয় দিয়ে কোথাও পাঠাবার দরকার কি। নিজেই একটা কিছু খুঁজে নেবে এখন। সে-কথা আমি না হয় ওকে সময় মতো কায়দা করে জানিয়ে দেব?

দেশলাই-এর ওপর সিগ্রেট দিয়ে টুকটুক শব্দ করে বলেছিল দত্তরায়, বোকা-বোকা চেহারা, নোংরা পোশাক-আশাক। বয়-বেয়ারা ড্রাইভারের সামনে মান রাখা মুশকিল হবে ওরা এখানে এসে থাকলে।

কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে, স্বামীকে আশ্বাস দিয়েছিল শমিতা, আমি সব ঠিক করে নেব। একটা ঘর যখন খালি পড়েই আছে এখন—সম্পর্ক দূরের হলেও তোমার ভাই আর ভাইএর বউ তো বটে।

হুঁঃ, মুখ দিয়ে শুধু একটা অদ্ভুত শব্দ করেছিল দত্তরায়। কোন উত্তর দেয়নি শমিতার কথার।

প্রথম দর্শনেই হতাশ হল শমিতা।

যেমন ভেবেছিল তার চেয়েও দীন। যেমন শুনেছিল তার চেয়েও মলিন। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। মায়া হয়।

শীর্ণ করুণ চেহারা অনিলার। গায়ে সাধারণ সাদা সাড়ি। প্লাস্টিকের লাল চুড়ি হাতে। কানে কিছু নেই। গলায় কিছু নেই। পায়ে এক পাটি চটির স্ট্র্যাপ ছেঁড়া।

ময়লা রঙিন সার্ট পরেছে বিকাশ। দাড়ি কামায়নি। চুল কাটেনি অনেক দিন। খাট ধুতিতে কাদা লেগে আছে।

রাস্তার কুকুর-বেড়ালের দিকে মানুষ যেমন দৃষ্টিতে তাকায় তেমন নির্বিকার দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে শমিতা বলল, এস তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

ওরা এল শমিতার পিছনে পিছনে। ভয়ে ভয়ে। আস্তে আস্তে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে। রাস্তার কুকুর-বেড়ালের মতোই।

ঘর খুলে শমিতা বলল, এই যে, পাখির স্বরের মতো পিক্ করে সুইচের শব্দ হল। পাখা আছে।

সবই আছে সে-ঘরে। খাট। আলমারী। আয়না। আলনা। মোড়া। চেয়ার। দেয়ালে টাঙান বিলিতি ছবি। লাল কার্পেট।

অহঙ্কার ভর করল শমিতার হাসিতে, এই ঘরে থাকবে তোমরা।

সে ভেবেছিল ওরা চমকে যাবে ঘরে ঢুকে। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখবে আসবাব। নিজেদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে কৃতজ্ঞতায় গলে যাবে শমিতার কাছে।

কিন্তু ওরা তাকিয়ে দেখল না ঘরের কোন জিনিসের দিকে। কথা বলল না একটিও। যেমন ধীর পায়ে ঢুকেছিল, ঠিক তেমন করে ঘরের শেষ প্রান্তে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। দুজনেই। তাকিয়ে রইল পুরানো গাছগুলির দিকে। সবুজ ঘাসভরা মাঠের দিকে। যেখানে পথ সরু হয়ে বেঁকে গেছে সেই দিকে।

একটু জোরে বলে উঠল শমিতা, বিছানার চাদর আছে তোমাদের ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হেসে অনিলা বলল, দরকার নেই।

বিকাশ বলল, দরকার নেই।

কিন্তু বিছানায় কি পাতবে তোমরা ?

বিকাশ বলল, আমার ধুতি আছে।

অনিলা বলল, আমার ছেঁড়া সাড়ি আছে!

ধুতি-সাড়ি পাতবে ওরা দামী গদিতোষকের ওপর। এ ঘরে দাঁড়িয়ে ওরা এমন কথা বলে কেমন করে। আশ্চর্য। কিছু নেই ওদের। কে জানত ওরা এত গরীব। খালি হাতে, এক কাপড়ে এসে উঠেছে এখানে। অবাক হয়ে গেল শমিতা। বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কত পাখি ডাকে এখানে!

হাওয়ার কী জোর এখানে!

পাখার দরকার নেই।

কিছু দরকার নেই।

ঘরে থাকবারও দরকার নেই। কত জায়গা ঘুরে বেড়াবার। কত বড় বারান্দা। কত বড় ছাদ। ওরা বেরিয়ে এল। দেখল। দেখাল। আকাশ। কৃষ্ণচূড়ার ডাল। ফুলের বাগান। ফলের গাছ। জাহাজের বাঁশি শুনল। শোনাল।

হাসি ফুটে উঠল শমিতার মুখে! এমন তো কখনও দেখেনি ওরা। তাই দিশাহারা হয়ে পড়ছে। কাঙালের মতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শমিতা। বিস্ময়ের একটা থমথমে আভা ফুটে উঠল মুখে। দেখেনি কখনও। ভাবেনি কখনও। এখানে সত্যিই ওরা বেমানান! এ বাড়ির নিয়ম জানেনা ওরা।

বাবুর্চি আসে বেলায়। দত্তরায় জাগে দেরিতে। ভোরে উঠে স্টোভে চা করে শমিতা স্বামীর ঘুম ভাঙায়। এখন হয়ে আসছে চিরদিন। স্বামীদের রান্নাঘরে ঢোকার অভ্যাস নেই বলেই তো জানে শমিতা।

কিন্তু বিকাশ অনিলার সঙ্গেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। স্টোভ জ্বলছে। কেটলি বসানো হয়েছে তার ওপর। হাত বাড়িয়ে চায়ের সরঞ্জাম অনিলার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে বিকাশ। অনিলা কথা বলছে অনর্গল। কথা শুনতে শুনতে হাসছে বিকাশ। কাছে এগিয়ে আসছে অনিলার। হাত ধরছে। চুল ঠিক করে দিচ্ছে। অনিলা সরে যাচ্ছে। চোখ রাঙিয়ে ঠেলে দিচ্ছে বিকাশকে।

শমিতা দেখল অদ্ভুত অস্বাভাবিক এই দৃশ্য সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে।

দেখল আর ভাবল, হয়তো বেকার বলেই এ সম্ভব। হয়তো দরিদ্রের দিন কাটানোর রীতিই এমনি। সে তো জানে না ওদের দৈনন্দিন জীবন ধারণের নিয়মকানুন।

রান্নাঘরে এসে ভদ্রতা করে শমিতা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বুঝি খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস?

না উঠে উপায় কি বৌদি, কারখানায় চাকরি করতাম যে—

বাধা দিয়ে অনিলা বলল, দরকার নেই অমন চাকরির। অত পরিশ্রম করলে শরীর থাকে নাকি মানুষের!

হেসে বলল বিকাশ, আমার শরীর ঠিকই ছিল। কিন্তু আমার জন্যে ভাবনা করে হার্ট দুর্বল হল অনিলার।

তোমার হার্টের অসুখ বুঝি?

না না, ওঁর কথা শুনবেন না। কোন অসুখ আমার নেই—

সেই সাড়ি। সেই সার্ট। কেমন করে এক কাপড়ে দিন কাটায় ওরাই জানে। হয়তো কাটাতে পারে অনেক দিন। ভাবতেও খারাপ লাগে শমিতার।

একটু ইতস্তত করল শমিতা, আমার কয়েকটা সাড়ি পাঠিয়ে দেব তোমার ঘরে? একেবারে নতুন—

দরকার নেই, নিজের সাড়ি দেখিয়ে অনিলা বলল, এই তো সাড়ি আছে।

কাল থেকে একটাই তো পরে আছ।

এটাই তো পরি, খিলখিল করে হেসে অনিলা বলল, রোজ রাত্তিরে কেচে দিই। ভোরের আগে হাওয়ায় শুকিয়ে যায়। কালও কেচে দিয়েছিলাম।

অসম্ভব কথা শোনে শমিতা। বিশ্বাস করতে পারে না। অনিলার সাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। বিকাশের সার্টের দিকেও।

তুমিও তাই কর নাকি বিকাশ? তোমার দাদার সার্ট প্যান্ট ব্যবহার করবে? অনেক বাড়তি আছে।

দরকার নেই। পাঞ্জাবি আছে আমার একটা। বিয়ের সময় পেয়েছিলাম।

বিয়ের সময়? শমিতা হেসে উঠল, ক বছর বিয়ে হয়েছে তোমাদের?

ছ বছর। দাদার বিয়ের আগে আমি বিয়ে করেছিলাম।

শমিতার হাসি নিভে যায় হঠাৎ। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ও উঠে দাঁড়ায়। এত অবান্তর কথা না বললেই চলত। এসব জেনে কি লাভ তার।

তবু যাবার সময় ও বলে যায়, বাথরুমে নতুন মাজন রেখে এসেছি তোমাদের জন্যে। ওটা তোমরা ব্যবহার করবে।

দরকার নেই, বিকাশ বলল, কাঠকয়লার এত ছাই এই যে—ওতেই আমরা কাজ চালিয়ে নিই।

অনিলা বলল, আমাদের জন্যে একটুও ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

বিকাশ বলল, ভাবনা করবার কোন দরকার নেই।

নিজের শোবার ঘরে আবার ফিরে এল শমিতা। ক্লান্তি জড়ানো চাপা আলোয় ঠাসা গুমোট ঘর। পর্দা সরানো হয়নি তখনও। সূর্যের আলো চোখে লাগলে ঘুমতে পারে না কমাণ্ডার দত্তরায়।

এই—টিপয়ের ওপর চায়ের কাপ রেখে স্বামীর কপালে হাত দিয়ে ডাকল শমিতা।

দত্তরায় জোরে তার হাত চেপে ধরল। টেনে খাটে বসাল। আদর করল। বুকের ওপর টেনে নিল।

এই—ওরা আছে—

বাধা না মেনে দৃঢ় আলিঙ্গনে শমিতার শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল দত্তরায়।

ওরা আসবার দিন কয়েক পর আবার একটা নতুন জাহাজ এল। প্রায়ই আসে। শুধু কমাণ্ডার দত্তরায় একা নয়, গঙ্গায় নতুন জাহাজ লাগলে শমিতাও সমান ব্যস্ত হয়ে ওঠে। জাহাজের বড় বড় কর্মচারীদের কাছ থেকে নানা তথ্য জেনে নেয় কমাণ্ডার—

বুঝিয়ে দেয় নতুন কাজ। আর বয়-বেয়ারাদের ব্যস্ত করে তোলে শমিতা। সারা বাড়ি নতুন করে সাজায়।

ওই জাহাজের অফিসাররা সন্ধ্যেবেলা আসবে। আজ শমিতার বাড়িতে পার্টি। সে ওদের অভ্যর্থনা করবে। ওদের সঙ্গে নানা গল্প করে হাসাবে। নিজে হাসবে।

অভ্যেস হয়ে গেছে শমিতার। প্রসাধনের নিপুণ তুলি বুলিয়ে ঝলমলে সন্ধ্যায় জ্বালিয়ে তুলতে ইচ্ছে করে নিজের শরীর। হুইস্কির কটু গন্ধের মতো একটা ঝাঁঝ নিজেরও রোমকূপ থেকে বের করতে চায়।

শমিতার ঘরে অনেক গন্ধ কাঁপে তেমন সন্ধ্যায়। উগ্র মধুর কিংবা অদৃশ্য কোন ফুলের গন্ধের মতো, দূরান্তের সুবাসের মতো। ঠিক বোঝা যায় না। চেনা যায় না। কিন্তু তবু নেশা লাগে শমিতার। হয়তো নিজের গন্ধে নিজেই দিশা হারায়।

অন্ধকার নেই। কমাণ্ডার দত্তরায়ের কোয়ার্টার্সে সন্ধ্যা জ্বলছে। আলোর ঝাড়ে অসংখ্য মূল্যবান বালব্ বন্দী বিদ্যুতের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। অনেক গেলাস, অনেক বোতল, অনেক রঙীন কাঁচের বাসন মিষ্টি শব্দ করছে, তরঙ্গ তুলছে বেগবান জীবনের। শমিতাকে টানছে। ভোলাচ্ছে। চঞ্চল বিভোর করে তুলছে এই ঘরের সব কিছু। নরনারীর প্রলাপ আর উচ্ছ্বাস আর উদ্দাম কলরব। জীবনের। ঐশ্বর্যের। অহঙ্কারের। আড়ম্বরের। মিসেস কোণ্ডারের সাদা জর্জেট। নাগারকরের জ্বলজ্বলে চোখ। মাথুরের প্রসারিত হাত। রাজেশ্বরীর পাতলা গোলাপ-ঠোঁট। শেম্পসনের হাসি। আর স্কটল্যাণ্ডের পানীয়ের সেই পরিচিত পুরানো দীর্ঘ গুণগান। শমিতা শোনে। শোনায়। আবেগে। খুশিতে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়া কলকল ঝরনার মতো সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। রাতের নিঝুম প্রহর কাঁপে। তবু শমিতার ঘরে অন্ধকার হয় না। আনন্দের ক্লান্তি জ্বলে।

কিন্তু কমাণ্ডার দত্তরায়ের কোয়ার্টার্সের একটিমাত্র ঘরে তখনও আলো জ্বালা হয়নি। সব আলোর পাহারা এড়িয়ে শুধু সেই ঘরে অল্প অল্প অন্ধকার জমে আছে।

আজ ওদের ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ। দীন বেশে মলিন মুখে কোন অতিথির সামনে ওরা যেন না পড়ে। কঠিন নির্দেশ দিয়েছে দত্তরায়।

ওদের কথা শমিতার মনে পড়ল সকলের শেষে—খাওয়ার পাট চুকিয়ে প্রত্যেকে বিদায় নেবার পর। সামান্য কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে বটে ওদের জন্যে। কোন রকমে দুটো প্লেটে খাবার সাজিয়ে শমিতা এল ওদের ঘরে।

এ কি, আলো জ্বাল নি কেন?

অনিলা হেসে বলল, দরকার নেই।

বিকাশ হেসে বলল, দরকার নেই।

আলো না জ্বাললেও বাইরের আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোয় টেবিলটা স্পষ্ট দেখা যায়। ঠক ঠক শব্দ করে দুটো প্লেট নামিয়ে রেখে শমিতা বলল, তোমাদের খাবার।

কথা বলল না কেউ। তবু অকারণে হঠাৎ শমিতার মনে হল আলো অন্ধকারের দুজন মানুষ যেন একসঙ্গে আপন মনে এবারেও গুঞ্জন করে উঠল, দরকার নেই।

ক্লান্ত শরীর টেনে ছাদে এসে দাঁড়াল শমিতা। কয়েক মুহূর্ত। সামনের কদম গাছে জোর আলোর বাঁকা রেখা পড়েছে। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পুরু ডালের ওপর দুটো পাখি বসে ঝিমোচ্ছে। যথেষ্ট অন্ধকার নেই। আলোর রেখা বিশ্রামের

ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তাদের। তবু মাঝে মাঝে আদিম উল্লাসে ডানার শব্দ করছে পাখি। ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে আর একটার।

শমিতা তাকিয়ে রইল। এক দৃষ্টিতে। অন্য মনে। আলো-অন্ধকারে।

গাছের ওই দুই পাখির কিছু দরকার নেই। বনের হরিণ-হরিণীর কিছু দরকার নেই। হ্রদের হংস-মিথুনের কিছু দরকার নেই।

আবার শমিতা ফিরে এল বসবার ঘরে।

সোফায় হেলে পড়ে আছে দত্তরায়। হাত ঝুলে কার্পেটে ঠেকেছে। অনেক খালি সোডার বোতল জমেছে টেবিলের তলায়। ছাইদানে ফেলা সিগ্রেট নেভানো হয়নি বলে পাখার হাওয়ায় হু হু করে পোড়া সিগ্রেট নতুন করে জ্বলছে। আর চোখ জ্বালা করা ধোঁয়া এসে লাগছে শমিতার নাকে।

এই—

কোন রকমে বাঁ হাত বাড়িয়ে দেয় কমাণ্ডার।

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে শমিতা স্বামীকে দাঁড় করায়। তাকে আঁকড়ে ধরে দত্তরায়। তার কাঁধে ভর দিয়ে পক্ষাঘাতের রুগীর মতো চলে শোবার ঘরের দিকে। অসতর্ক পায়ের ধাক্কায় টেবিল থেকে গেলাস গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। ঝনঝন শব্দ হয়। পাখিরা ভয় পায়। কড়া আলোয় শমিতার চোখেও ধাঁধাঁ লেগে যায়।

স্বামীর সঙ্গে মাসের মধ্যে অনেকবার শমিতাকেও বাইরে যেতে হয়। অফিসারদের বাড়িতে শুধু নয়, নতুন জাহাজ এলে জাহাজেও। বিলিতি নাচের বাজনার তালে তালে

সেখানেও জলের ওপর অপরূপ সন্ধ্যা ঝলসায়। তা ছাড়া আয়োজন এক। সরঞ্জাম এক। ধরনটাও ঠিক বাড়ির কক-টেইলের মতোই।

নতুন জাহাজের পার্টি শেষ হতে দেরি হল বেশ। ক্যাপ্টেন ল্যানয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হল শমিতা আর দত্তরায়ের।

আজ শমিতার ইচ্ছে করছে স্বামীকে বুকে চেপে ধরে থাকতে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। বাহু উদগ্রীব হয়ে উঠছে। বুড়ো ক্যাপ্টেনের অনুরোধ অবহেলা করতে না পেরে শমিতাকেও জিন আর লাইম নিতে হয়েছে অনেকবার। গুম হয়ে গেছে দত্তরায়। রোজই হয়। তাকে শুইয়ে অনেকবার আদর করল শমিতা। কোন সাড়া না পেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে একা একা আস্তে আস্তে ছাদে চলে এল। সেই কদম গাছের কাছে এসে দাঁড়াল—সেদিন যেখানে দুটো পাখি দেখেছিল।

কোন পাখি নেই আজ গাছে। চাঁদের আলোর জোর আছে। ম্লান হয়ে গেছে চারপাশের সব কৃত্রিম আলো। থেমে থেমে জাহাজের একটানা বাঁশি বাজছে।

হঠাৎ নেশা ছুটে গেল শমিতার। কঠিন আঘাতে বোবা হয়ে গেল। প্রকৃতির উদ্দাম আলোয় ছাদের অন্য প্রান্তে অনিলা আর বিকাশকে দেখল শমিতা। রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। সাদা শাড়ির রঙ মিশে গেছে জ্যোৎস্নার রঙে। ওরাও মিশে গেছে। এক হয়ে গেছে। নির্জনে। বাঁশির শব্দে। চাঁদের আলোয়।

এতটুকু কৌতূহল নেই আজ শমিতার চোখে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও রুদ্ধ আক্রোশে জ্বলতে লাগল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চোরের মতো পালিয়ে এসে হাঁপাতে

লাগল। মদের উৎকট গন্ধভরা বুক চিরে কথা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে শমিতার।

হাতে সোনার বালার দরকার নেই। কানে হীরের ফুলের দরকার নেই। গলায় দামী নেকলেসের দরকার নেই। রোজ নতুন নতুন ফিনফিনে শাড়ির দরকার নেই। কিছু দরকার নেই। শুধু দরকার—

কিন্তু কমাণ্ডার দত্তরায় তখন একেবারে বেহুঁশ।

সকাল বেলা চা খাবার পর বিকাশকে ডেকে দত্তরায় বলল, চাকরি বাকরির কিছু সুবিধা করতে পারলে? অনেক দিন তো বসে রইলে চুপচাপ?

বিকাশ কাশল, বিশেষ সুবিধা করতে পারি নি। অনিলার হার্টের অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে কদিন থেকে—

সেকথা কানে তোলা দরকার মনে করল না দত্তরায়, তোমার মতো লোকের পক্ষে চাকরি পাওয়া খুব শক্ত আজকাল। কত কোয়ালিফায়েড ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিগ্রেটের হালকা ধোঁয়া ছেড়ে দত্তরায় বলল, যাহোক একটা ব্যবস্থা করেছি আমি। কাল থেকে ডকে তোমার চাকরি হয়ে যাবে। আজ দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে তুমি কমাণ্ডার মেননের সঙ্গে দেখা করো—

চমকে উঠে বিকাশ বলল, আজ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজই আফটার লাঞ্চ। না হলে ওটা ফিল্ড ইন হয়ে যাবে।

কি একটা কথা বলতে চাইল বিকাশ। কিন্তু বড় কঠিন মনে হচ্ছে দত্তরায়ের মুখ। এক মনে খবরের কাগজ পড়ছে। কিছু বলতে পারল না বিকাশ।

সন্ধ্যেবেলা আগুন জ্বলে উঠল সেদিন।

কমাণ্ডার দত্তরায় গর্জন করে উঠল, কেন যাও নি তুমি মেননের সঙ্গে দেখা করতে ?

নির্বিকার স্বর বিকাশের, আমি দমদমে গিয়েছিলাম। ফিরতে দেরি হয়ে গেল—

আজই সেখানে না গেলে চলত না তোমার ? কি এমন দরকার পড়েছিল ?

বিকাশ বলল, না, আজ না গেলে চলত না। কাল সারা রাত খুব কষ্ট গেছে অনিলার। হার্টের অসুখের টোটকা ওষুধ আনতে আমি দমদম গিয়েছিলাম—

বিকৃত মুখে চিৎকার করে উঠল কমাণ্ডার দত্তরায়, মুখ দেখতে চাই না তোমাদের। কাল সকাল বেলা উঠে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে। ইমবেসিল কোথাকার !

উত্তেজনাহীন শান্ত স্বরে বিকাশ বলল, বেশ, তাই যাব।

সে আর দাঁড়াল না সেখানে।

কোথায় আর যাবে। চাকরি নেই। যাবার জায়গা আছে নাকি কোথাও। শমিতা ভাবল, কাল সকালে রাগ পড়ে যাবে দত্তরায়ের। ওরাও থেকে যাবে। যেমন আছে তেমন।

কিন্তু পরদিন ভোরবেলা দরজা খুলে শমিতা দেখল ওরা দাঁড়িয়ে আছে তার শোবার ঘরের ঠিক সামনেই। যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে শমিতার দরজা খোলবার অপেক্ষায়। জিনিসপত্র তো আর কিছু নেই। দুজনের হাতে শুধু দুটো কাগজের মোড়ক।

শমিতাকে প্রণাম করে হাসিমুখে অনিলা বলল, আমরা চললাম। অনেক বিরক্ত করে গেলাম আপনাকে। কিছু মনে রাখবেন না।

বিকাশ হেসে বলল, দাদাকেও বলে দেবেন।

অবাক হয়ে অনিলাকে জিজ্ঞেস করল শমিতা, কিন্তু কোথায় যাবে তোমরা ?

কথার ওপর বেশ জোর দিল অনিলা, উনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে। সঙ্গে তো রইলেন ভাবনা কি !

বিমূঢ় দৃষ্টিতে অনিলার দিকে তাকিয়ে রইল শমিতা। বেকার স্বামীর ওপর ভরসা করে নির্ভরের এত বড় আশ্বাস কেমন করে পায় এই রোগা মেয়েটা।

ওরা চলে গেল। প্রথম দিন যত ভোরে এসেছিল ঠিক তত ভোরে। যেমন করে এসেছিল ঠিক তেমন করে। ভয়ে ভয়ে। আস্তে আস্তে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে। রাস্তার কুকুর-বেড়ালের মতো নয়। গাছের দুই পাখির মতো। বনের হরিণ-হরিণীর মতো। হ্রদের হংস-মিথুনের মতো। সবুজ ঘাস ভরা মাঠ পেরিয়ে, পুরানো গাছের পাশ দিয়ে, আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওরা এগিয়ে গেল। শমিতা দেখল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ।

তিনটে নতুন জাহাজ এসেছে। সারা রাত বাঁশি বাজবে। শমিতা ঘুমতে পারবে না। যন্ত্রণায় ছটফট করবে।

উঠে দাঁড়াল শমিতা। সমস্ত শরীর কাঁপছে। ব্যস্ত হয়ে কাছে এল নার্স। জানতে চাইল কি চাই। উঠতে বারণ করল। কোন বাধা মানল না শমিতা। কোন বারণ শুনল না। টলতে টলতে জোর করে চলে এল সেই ঘরে—যেখানে ওরা ছিল।

শূন্য চোখে ঘরের চারপাশে তাকাল শমিতা। দেয়ালে-দেয়ালে এখনও উত্তাপের আমেজ লেগে আছে। শমিতার গায়ের তাপের মতো যন্ত্রণার উত্তাপ নয়, ত্রিভুবন ভরানো এক মধুর উত্তাপ। সে

বোধ হয় বুঝতে পারে বেকার স্বামীর ওপর ভরসা করে রোগা মেয়েটা নির্ভরের এত বড় আশ্বাস কোথা থেকে পায়।

কমাণ্ডার দত্তরায়ের কোয়ার্টার্সের দৃঢ় দেয়াল পেরিয়ে ওরা চলে গেছে। জাহাজের বাঁশি আর শুনতে পাবে না। কিন্তু বাঁশি আছে ওদের সঙ্গে। সে-বাঁশি ওরা বাজাবে যখন যেখানে থাকবে সেখানে। সকালে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় সারাক্ষণ। ছ বছর ধরে যেমন বাজিয়ে এসেছে তেমন করে।

বাঁশি নেই শমিতার। ও বেরিয়ে যেতে পারবে না ওদের মতো। বিকট যন্ত্রণায় শুধু জাহাজের বাঁশি শুনবে।

নিজে বাঁশি বাজাতে পারবে না কোনদিন।

২৬শে অগস্ট : ১৯৫৭

সোমবার সকাল : কলিকাতা

॥ ধিক্কার ॥

চেনা চেনা গলার স্বর। মিনতি করছে। কিন্তু কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবেন না নরেন বাবু। তিনি বেশ জোরে কথা বলছেন। তাঁর প্রত্যেকটি কথা কানে আসছে সুরমার।

বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন সুরমা। ওঠবার ক্ষমতা নেই। নাহলে বাইরে এসে মেয়েকে দেখে যেতেন একবার। সুরমার বুঝতে দেরি হয় না, অসুখের খবর পেয়ে নমিতা এসেছে তাঁকে দেখতে।

একমাত্র নমিতারই পথ রোধ এমন করে করতে পারেন নরেন বাবু। আর কাউকে বাইরে থেকে কর্কশ স্বরে বিদায় করে দিতে পারেন না তিনি। বিছানার শুয়ে হঠাৎ ছটফট করতে থাকেন সুরমা। বিরক্ত হয়ে ওঠেন মনে মনে। স্বামীর ওপর নয়। মেয়ের ওপর।

কি দরকার ছিল সোহাগ দেখাতে আসবার। এতই যদি টান মায়ের ওপর তাহলে অদ্ভুত বিয়েটা করবার সময় সেকথা খেয়াল ছিল না কেন।

অদ্ভুত বৈকি। অমন বিয়ে এ বংশে আর কেউ কখনও করেনি। হোক না কলকাতার বনেদী বংশের ছেলে। তা বলে তার জন্যে জাতকুল বিসর্জন দিতে হবে ?

ভেতরে ভেতরে কখন রস ঘন হয়ে উঠেছিল একেবারেই বুঝতে পারেন নি সুরমা। একটুও সন্দেহ করতে পারেন নি মেয়েকে। যদি পারতেন তাহলে শুরুতেই সে-পথে কাঁটা দিতেন। কলেজের

খাতা থেকে সবচেয়ে আগে নাম কাটিয়ে দিতেন। চোখের আড়াল করতেন না এক মিনিটের জন্যেও। দেখা যেত বাপ-মায়ের অবাধ্য হয়ে ভিন্ন জাতে বিয়ে করবার সাহস মেয়ের কেমন করে হয়। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন ওসব কথা ভেবে আর লাভ নেই।

না জানিয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে বিয়ে অবশ্য করেনি নমিতা। কিন্তু জানিয়েছিল ঠিক সময়। একদিন আগে পরে নয়। জানিয়েছিল যেদিন বিয়ে করল সেইদিন।

নমিতা বলল ভেবে ভেবে আস্তে আস্তে বেশ গুছিয়ে। কিছু গোপন না করে জানিয়ে দিল সুরমাকে। যেন তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দেবেন—যেন ব্যাপারটা সহজ এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাওয়ার মতোই।

বাপের সঙ্গেও কোন দ্বিধা না করে সমানে তর্ক করল নির্লজ্জ মেয়ে। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন সুরমা। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে অনেক সময় লেগেছিল তাঁর।

এ বিয়ে তুমি করতে পারবে না—কিছুতেই না। এমন বিয়ে এ বংশে কেউ কখনও করেনি—

কেউ করেনি বলে যে কেউ কখনও করতে পারবে না এমন কোন অমোঘ নিয়ম নেই।

একশ বার আছে। আমাদের মুখে কালি ছিটিয়ে যাবার কোন অধিকার তোমার নেই।

কালি ছিটিয়ে যাচ্ছে কে? সত্যকে মেনে নেওয়ার নাম কালি ছিটোন নয়।

কিন্তু তোমার বংশের দাম নেই?

তার চেয়েও অনেক বেশি আমার মনের দাম।

থাম। ভিন্ন জাতের ছেলেকে নিয়ে বড়াই কর না। আমরা কি ভাল ছেলের সন্ধান আনতে পারতাম না?

জানি না।

জাত কুল ভুলে নিচে নামবে তুমি? আর কারুর কথা না ভেবে নিজের স্বার্থ বড় করে দেখবে?

তোমরাই বা আমার কথা না ভেবে শুধু নিজেদের স্বার্থের কথা ভাববে কেন? রূপ, গুণ, বিদ্যাবুদ্ধি, অর্থ—কোনদিক থেকেই অরবিন্দ কারুর চেয়ে ছোট নয় বরং অনেক বড়—

সব চেয়ে বড়--

দুজনকে থামিয়ে দিয়েছিলেন নরেন বাবু। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাধা দিয়েও লাভ হবে না। করুক নমিতা যা খুশি। না মানুক নিয়ম। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবেন নরেন বাবু ততদিন তিনিও তাঁর নিজের সত্যকে ছাড়বেন না। ততদিন মেয়ের মুখ দেখবেন না তিনি। সন্তান বলে স্বীকার করবেন না তাকে। সে যেন কোনদিন কোন কারণেই তাঁদের কাছে আর না আসে! নমিতার বিয়ে মৃত্যু বলেই ধরে নেবেন তিনি।

চমকে উঠেছিলেন সুরমা। সামলে নিয়েছিলেন পরমুহূর্তেই। তাঁর স্বামীর প্রত্যেকটি কথা তাঁকেও মেনে নিতে হবে।

এ পরিবার থেকে চলে যাক নমিতা। মরে যাক। মৃত্যুশোকের মতোই আঘাত দিয়ে ফুরিয়ে যাক একেবারে।

তারপর স্বামীকে দেখতে দেখতে আশ্চর্য হয়ে গেছেন সুরমা। অটল ধৈর্যের সঙ্গে তিনি সব সহ্য করেছেন। মেয়ের নাম মুখে আনেন নি একদিনও।

যার খুশি সে চলে যাক। কিন্তু এ বাড়ির একটা নিয়ম আছে। এখানে যারা বাস করবে তাদের সে-নিয়ম মানতে হবে বৈকি। অসামান্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে নিয়ম মেনে চলেছেন নরেন বাবু।

মাঝে মাঝে বরং সুরমাই অন্য সুর গেয়েছেন। মেয়ের জন্যে আকুল হয়েছেন। জামাইকে দেখতে চেয়েছেন। করুণ মুখে

নরেন বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করেছেন। দাগ কাটবার চেষ্টা করছেন তাঁরও মনে।

কিন্তু নরেন বাবু নির্বিকার। ভাবে-ভঙ্গিতে তিনি এই কথাটাই সুরমাকে বুঝিয়েছেন যে, মৃতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখা যেমন সম্ভব নয়, নমিতার সঙ্গে দেখা হওয়াও তেমনি অসম্ভব। কাজেই মনের ক্ষীণতম ইচ্ছাকেও যেন সুরমা প্রশ্রয় না দেন।

প্রশ্রয় দেননি সুরমা। মনপ্রাণ দিয়ে স্বামীকেই মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুকরণ করেছেন। একের পর এক ছিঁড়ে ফেলেছেন নমিতার চিঠি।

অনেক চিঠি লিখত সে প্রথম প্রথম। ক্ষমা চেয়ে, অন্যায় স্বীকার করে, অরবিন্দকে নিয়ে একবার এ বাড়িতে আসবার অনুমতি প্রার্থনা করে।

কিন্তু কোন চিঠির উত্তর দেননি সুরমা। সাহস পান নি নরেন বাবুকে এসব কথা জানাবার।

সুরমা অন্তিমশয্যায়, সে-খবর কোথা থেকে পেয়ে সব ভুলে তাঁকে দেখতে এসেছে নমিতা। তাঁর মাথার কাছে সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

কিন্তু প্রেতচ্ছায়া এ সংসারে প্রবেশ করতে পারে না। সেই কথাটা তাঁকে জোর গলায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন নরেন বাবু। নিজের স্বার্থের জন্যে সে নিয়ম ভাঙতে পারে কিন্তু অন্যকে দিয়ে নিয়ম ভাঙাতে পারে না। প্রেতিনীর কোন অনুরোধ মানবেন না নরেন বাবু। কিছুতেই বাড়ির ভেতরে সে ঢুকতে পারে না।

সুরমা দুই কান খাড়া করে সব শুনলেন। তাঁর কাছে আসতে পারল না নমিতা।

আর একজন কে নরেন বাবুর কথা শেষ হবার পর বলে উঠল, নমিতা চল ফিরে যাই।

গলা শুনে আন্দাজে সুরমা ধরতে পারলেন—তাঁর জামাই। ওরা দুজনে এসেছে তাঁকে দেখতে একসঙ্গে।

মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল সুরমার। হয় তো আর বাঁচবেন না তিনি। জামাইকে কোন যত্ন করতে পারবেন না কোন দিন। তাঁর সঙ্গে আর কারুর দেখা হবে না। বড় বংশের ছেলে। বাইরে থেকে বিতাড়িত হল। কোন পরিচয় পাবে সে নমিতার বাপ-মায়ের! শেষবারের মতো, মাত্র অল্প সময়ের জন্যে তাঁর মাথার কাছে এসে তাদের দাঁড়াতে দিলেই তো পারতেন নরেন বাবু। একটু কান্নাকাটি, একটু মিষ্টিমুখ, একটু আদরযত্ন—তাহলেই শান্তিতে মরতে পারতেন সুরমা। মরবার সময় আর কোন দুঃখ থাকত না তাঁর।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। অল্প অল্প শীতের আমেজ আছে হাওয়ায়। ম্লান আলো জ্বলছে সুরমার ঘরে।

আস্তে আস্তে নরেন বাবু এসে বসলেন খাটের পাশে। কোন কথা বললেন না। অটল ব্যক্তিত্ব তাঁর। সুরমা জানে ওদের সম্পর্কে কোন কথাই তুলবেন না তিনি।

ছটফট করতে লাগলেন সুরমা। ভেবেছিলেন তিনিও চুপচাপ থাকবেন। যেন জানতে পারেন নি ওদের আগমন। জয় করে নেবেন ভাবপ্রবণ কতগুলো দুর্বল মুহূর্ত। কঠিন নির্বিকার হয়েই থাকবেন তাঁর স্বামীর মতো। বংশের সুনামের কথা ভেবে মনের জোর বজায় রেখে শেষ নিশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলেন না সুরমা।

ওদের কয়েক মিনিটের জন্যে—ইতস্তত করলেন সুরমা, আমার কাছে আসতে দিলেই তো পারতে—

ভেবেছিলেন সেই পুরনো কথাই বলবেন নরেন বাবু। যে

ইহলোকে নেই তাকে আনা যায় নাকি ঘরের ভেতরে। নমিতা তো মরে গেছে ওর বিয়ের দিন।

কোন কথা বললেন না নরেন বাবু। মাথা নিচু করে সুরমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন চুপচাপ।

বেশি দূরে তো যায়নি, ওঠবার চেষ্টা করে আবার বললেন সুরমা, যাবে? ডেকে আনবে? মেয়ে-জামাইকে এক সঙ্গে দেখব না?

তবু নির্বিকার নরেন বাবু। তবু কথা বলেন না। সুরমা তাঁর হাত চেপে ধরলেন। অনুনয় করলেন। ওরা আসুক। ওরা তাঁকে দেখে যাক মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। আর কোনদিন ওদের দেখতে চাইবেন না সুরমা।

তারপর কি হবে? কঠিন নয়, নির্বিকার নয়, আর্তের মতো গলার স্বর নরেন বাবুর। বড় লোকের ছেলে, বসতে দেব কোথায়? ওই ভাঙা চেয়ারে? যদি থাকতে চায়, মেয়ে-জামাইকে থাকতে দেব কোথায়? এই একটিমাত্র দম বন্ধ করা ছোট ঘরে? খেতে দেব কি? বড়লোক জামাইকে যত্ন করবার পয়সা কোথায়? একটু চুপ করে থাকেন নরেন বাবু, ব্যবধান থাক সুরমা। বাইরে থেকে ব্যক্তিত্বের দম্ভ দেখে মনে মনে শ্রদ্ধা নিয়ে জামাই ফিরে যাবে। কিন্তু ব্যবধান ঘুচিয়ে ভেতরে আসতে দিলে ও কৃপা করবে। দারিদ্র্যকে শ্রদ্ধা করতে পারে নাকি কেউ?

কথা শুনতে শুনতে বিমূঢ় হয়ে যান সুরমা। একটা বিরাট পাহাড় যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে তাঁর চোখের সামনে। স্বামীর হাত ঠেলে দূরে সরিয়ে দেন তিনি।

বাইরে থেকে শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে যাক মেয়েজামাই। কিন্তু ভেতর থেকে স্বামীর ওপর শ্রদ্ধা নিয়ে কেমন করে এ সংসার ছেড়ে যাবেন তিনি।

একটু আগে তাঁর মৃত্যু হলেই ভাল হত—ওদের বিদায় করে নরেন বাবুর ভেতরে আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে!

২রা সেপ্টেম্বর : ১৯৫৭
সোমবার সকাল : কলিকাতা

।। দাঁড়িপাল্লা ।।

সেই রাতেই পুলিস এল।

হয় তো আসত না। কে জানে ওরা মিটমাট করে নিত কিনা। কিন্তু সবকিছুর একটা সীমা আছে। কত আর সহ্য করতে পারে মানুষ।

সকাল নেই সন্ধ্যে নেই—সময় অসময় নেই, দিনরাত গোলমাল চিৎকার হৈ হৈ। পুলিসে টেলিফোন না করে দিনের পর দিন চোখ কান বুজে এই অশ্লীল কলহ উপভোগ করবার মতো ধৈর্য মিহিরের নেই।

রমা বারণ করেছিল। কি দরকার এসব ব্যাপারে মাথা গলাবার। ওদের চটিয়ে দেয়া ঠিক নয়। রাত করে মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরে মিহির। রাগ পুষে রাখলে ওরা কখন কি করে বসে ঠিক নেই।

রমার বারণ মিহির শোনে নি। এটা মগের মুলুক নয় যে, যার যা খুশি তাই করবে। অত আমল দিয়েই তো মাথায় তোলা হয়েছে ওদের। তাই যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে ওরা। পান থেকে চুন খসলে ধর্মঘট করে মিছিল বার করে। মিহিরের হাতে ক্ষমতা থাকলে একদিনে সে ওদের শায়েস্তা করে দিত।

কিন্তু তার হাতে যখন তেমন কোন ক্ষমতা নেই তখন এদের হট্টগোলে সে শুধু স্ত্রীর কাছেই গজগজ করে। আস্ফালন করে। বাইরে গিয়ে চোখ রাঙিয়ে ওদের থামিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু বাধা দেয় রমা। স্বামীকে বোঝায়, বিবাদ ছাড়া কি

আছে ওদের জীবনে। কলহ করেই সুখ পায় ওরা। পাক। বাধা দিয়ে কেন বেচারিদের সুখ নষ্ট করবে মিহির।

আর আমাদের সুখ? বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে মিহির, যতক্ষণ বাড়িতে থাকব ওই খ্যানখ্যানে গলা শুনতে হবে—আর রাস্তায় বার হলেই কুৎসিত চেহারা দেখতে হবে। কলকাতা শহরের বাড়িওলাগুলোও হয়েছে তেমনি। এক একটা স্কাউণ্ড্রেল। ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে হয় ওদের, দাঁতে দাঁত চেপে বলে মিহির, নবাবী আমলে যেমন করা হত—

মিহির যেন দেখতে না পায় এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে রমা মুচকি হাসে। বস্তির লোকগুলোকে শায়েস্তা করতে চায় তার স্বামী। বাড়ীওলাদের ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে চায়। কিন্তু কিছুই করবার ক্ষমতা নেই বলে আস্ফালনটা হাস্যকর মনে হয় রমার। অপরিণত বুদ্ধির এক অক্ষম দাম্ভিক মানুষ বলে ধরে নেয় মিহিরকে। তাই বোধহয় হাসি পায় তার।

তুমি আর কতক্ষণ বাড়িতে থাক, বেশ আস্তে রমা বলে, অসুবিধা আমারই হওয়ার কথা। আমিই তো বাড়ি বসে থাকি সারা দিন।

কেমন করে থাক তুমিই জান।

বললাম তো, আমার কোন অসুবিধা হয় না। আর উপায় যখন নেই তখন--

বাধা দিয়ে মিহির বলে, উপায় নেই মানে? নিশ্চয়ই উপায় আছে। ইচ্ছে করলে—

না, না, তুমি কিছু কর না। বেশ আছি তো। অমন একটু আধটু অসুবিধা এখন কলকাতায় সব পাড়াতেই লেগে আছে। যেখানে যাবে সেখানে অশান্তি—

রমা আর দাঁড়ায় না সেখানে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে একটা গোটা বাড়ি পাওয়া গেছে। নিচে একটা ঘর আর ওপরে দুটো। অন্যান্য বাড়ির তুলনায় ভাড়া রীতিমতো কম। কারণ এই বাড়িটা একেবারে বস্তির গা ঘেঁষে।

ট্রাম থেকে নেমে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়। রাস্তার দু-পাশেই বস্তি। ঘরে ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলে। ধোঁয়া ওঠে। সুর করে ছেলে নামতা পড়ে। মেয়ে কাঁদে।

স্বামী শব্দ করে ঘন ঘন থুতু ফেলে। তার নিটোল স্বাস্থ্যের বউ বোধহয় রাঁধতে রাঁধতে তরকারিতে একটু বেশি মাত্রায় ফোড়ন দিয়ে নিজেই খক খক করে কাশে।

দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প অন্ধকারে রমা তাকিয়ে দেখে ওদের সংসার। মিহির ফেরে না এত তাড়াতাড়ি। যখন ফেরে তখন প্রায়ই দৃশ্যের পরিবর্তন হয়। রমা আর ওদের কারুর চেহারা দেখতে পায় না। কিন্তু গলা শুনে অবাক হয়ে ভাবে ওই রোগা স্বামী এত চেঁচাতেও পারে।

বউও কিছু কম যায় না! হাতাহাতি হয় কিনা রমা ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু হলেও বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। বউও প্রয়োজন হলেও দু ঘা বসিয়ে দিতে যে ইতস্তত করবে না, তার গলাবাজির চোটে রমা সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়।

অবশ্য এত ফাটাফাটি করবার কোন মানেই হয় না। কারণ একেবারেই তুচ্ছ। কোলের ছেলেটা হামাগুড়ি দিতে গিয়ে ইঁটের ঠোক্কর খেয়ে গলা ফাটাচ্ছে।

স্বামী দাঁত খিঁচিয়ে বলে, বউটার কি হুঁশ নেই। বাচ্চাটা সাবাড় হতে চলল যে—

ফোড়নের প্রতাপে নাকের জলে চোখের জলে বিব্রত হয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বউ বলে ওঠে, স্বামী কি পঙ্গু? হাত্-পা কাটা গেছে

নাকি কলে ? লাটবেলাটের মত বসে না থেকে ছেলেটার দিকে একটু লক্ষ রাখলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।

ঘরের বউ না বাজারের মেয়েমানুষ ? স্বামীর হাত-পা কাটা যাওয়ার কথা যে চিন্তা করতে পারে সে গিয়ে নাম লেখাক—

তারপর গলার স্বর সপ্তমে ওঠে। স্পষ্ট শুনতে পায় রমা। কিন্তু সব কথার মানে বুঝতে পারে না। ভয় পায়। বিবর্ণ হয়ে যায় মুখ। খুন-খারাবি হবে মনে করে অস্বস্তি বোধ করে।

আর ঠিক সেই সময় গজ গজ করতে করতে দুম দুম করে পা ফেলে মিহির ওপরে উঠে আসে।

ওগো, মিহিরের দুটো হাত শক্ত করে ধরে প্রবল উত্তেজনায় রমা বলে, একটা কিছু হয়ে যাবে। তুমি তাড়াতাড়ি যাও। থামিয়ে দাও ওদের—

ঝোঁকের মাথায় সজোরে রমাকেই ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয় মিহির, গুলি করে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে সব কটাকে। তা ছাড়া ছোটলোকগুলোকে থামাবার আর কোন উপায় নেই—

একটু জোরেই রমাকে ধাক্কা দিয়েছিল মিহির। দেয়ালের গায়ে ছিটকে পড়ে মাথাটা টনটন করছে তার।

অত লক্ষ না করে মিহির বলে, কাল থেকে আবার বাড়ি খুঁজতে হবে। ছোটলোকের মধ্যে থাকবার চেয়ে ক্যানসারে ভুগে মরা ভাল।

রমার মাথাটা টনটন করছে তখনও। মিহিরের সব কথা কানে যায় না তার।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। শীতের আমেজ আছে হাওয়ায়। সিরসির করে শরীর। নিঃশব্দে প্রথম হেমন্তের কুয়াশা নামে। এক সুরে রাস্তার একটা কুকুর ডেকে চলে। কে জানে

কখন থামবে। মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যায় মিহিরের। বস্তির কুকুর বলেই বোধহয় এমন বেয়াড়া। পরের সুবিধা অসুবিধা চিন্তা করবার মতো বুদ্ধি নেই ওদের কারুর। না মানুষের, না জানোয়ারের।

কিন্তু বোধহয় তুমুল কলহের ফলাফলটা জানবার জন্যেই পরদিন ভোর বেলা রমা এসে আবার বারান্দায় দাঁড়ায়। ভয় মেশানো কৌতূহলে দুরু দুরু করে ওর বুক। কে জখম হয়েছে কে জানে।

ভিজে ভিজে সকাল। সূর্যের তেজ জোরালো নয় ততো। কিন্তু দূরের মাঠে ধোপারা কাপড় মেলে দিয়েছে এর মধ্যে। মোষগুলো জমা হয়েছে পুকুরের ধারে। পাতলা কুয়াশা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে রমার কৌতূহল। আজ ভোরের হাওয়া আশ্চর্যরকম ভারী আর ঠাণ্ডা। শীতটা বেশ আগেই এসে যাবে বোধহয়।

কিন্তু কোথায় কি। কে বলবে যে আগের দিন অমন প্রলয় হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। কারুর মুখে বিরক্তির কোন রেখাই নেই। শব্দ করে বালতিতে জল ভরছে বউ। গামছা জড়িয়ে ঘরে ঢুকলো স্বামী। বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। কিন্তু কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না ওটাকে নিয়ে। রান্নার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসছে।

ক্ষিপ্রগতি এখন বউএর চলাফেরার। একটা খাঁকি শার্ট পরে টেরি কাটে স্বামী। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে একটু আদর করে।

চিৎকার করে বউকে শাসায়, আর দেরি হলে খাওয়া হবে না—দিন দিন যেন কুঁড়েমি বাড়ছে বউএর—

লজ্জা পেয়ে বউ উত্তর দেয়, যাই গো যাই। বস না তুমি। ঠাঁই তো করে দিয়েছি কখন।

ছুটোছুটি করে বউ। বালতির উনুনটা দূরে সরিয়ে রাখে। বসে বসে মিষ্টি হেসে যত্ন করে খাওয়ায় স্বামীকে। হাসি উপভোগ

করবার সময় নেই স্বামীর। আয়েস করে খেতেও পারে না। কোন-রকমে গলাধঃকরণ করে শুধু। বউএর কাকুতি মিনতি শোনে না। অনেক বেলা হয়ে গেছে আজ। নাকে মুখে ভাত গুঁজে সেই ভোর-বেলা ছুটে বেরিয়ে যায় স্বামী।

বউ লক্ষ করে কিনা বুঝতে পারে না রমা, কিন্তু সে দেখে, ছুটে বেরিয়ে গেলেও, একটু দূরে গিয়ে বারবার পিছু ফিরে তাকায় স্বামী। কিন্তু বউটা বোকা। বাইরে দু এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার মতো বুদ্ধি তার নেই।

তবু হাসি মুখেই বারান্দা থেকে সরে যায় রমা।

তারপর থেকে আর রমা বিচলিত হয় না। ভয় পায় না। উত্তেজিত হয়ে ওঠে না মিহিরের মতো। বরং ঝগড়া উপভোগ করে ওই বস্তির মানুষগুলোর।

জোরালো উত্তাপ আছে যেন ওদের উলঙ্গ জীবনযাত্রায়—ঝগড়ায়ও। কিছু লুকোয় না। গোপন করে না মনের ভাব। সব কিছু ভুলে পাড়া মাতিয়ে যেমন বিষ ঢালে আবার ঠিক তেমন করে সুধার ভাণ্ডও উপচে দেয়। একটু একটু করে চতুর কৃপণের মতো রেখে ঢেকে নয়, আদিম মানুষের মতো উজাড় করে দুই হাতে।

মাত্র কয়েক গজ তফাত থেকে ওদের জীবনের রূপটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রমার কাছে। তাই সে প্রতিবাদ করে মিহিরের কথার। বাধা দেয় ওদের কোন ক্ষতি করতে চাইলে। ইচ্ছে করে ওরা তো আর বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না কারুর। রমা যেন ওদের স্বভাবের পরিচয় পেয়ে গেছে এর মধ্যে।

ঘরের তফাতটা মাত্র কয়েক গজ হলেও স্বভাবের তফাত বোধ-হয় আকাশ-পাতাল। সাজ পোশাক একেবারে অন্যরকম মিহিরের। রমারও তো বটেই। হবেই। কথা বলার ধরনটাও একেবারে

আলাদা। সেটাও স্বাভাবিক। চেঁচিয়ে কখনও কথা বলে না মিহির। ঝগড়ার সময়ও নয়। খুব রেগে গেলে দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে আস্তে রমাকে খোঁটা মারে। কথায় বিষ মিশিয়ে দেয়। এমন বিষ যে রমার হৃৎপিণ্ডটা আগুনের আঁচে যেন ধক ধক করে। চুপ করে থাকে না রমা। বউটার মতো চিৎকার করে পাল্টা জবাবও দেয় না স্বামীকে। বেশ আস্তে আস্তেই ভেবে ভেবে উত্তর দেয়। অন্তত এতদিন দিত।

কিন্তু সব ঘটনাটাই ঘটে গোপনে। সকলের অলক্ষ্যে। একটি লোকও টের পায় না। তাই নিজেদের কলহের মধ্যে কোন রঙ আবিষ্কার করতে পারে না রমা। উত্তাপও অনুভব করতে পারে না। হয়তো সেই কারণে একেবারে জুড়িয়েও যায় না কিছু। ভিজে ধোঁয়ার মতো ঠাণ্ডা কলহের কুণ্ডলী মনের কোণায় পাকিয়ে পাকিয়ে জমা হয়ে থাকে। আত্মতৃপ্তির দমকা হাওয়ায় শরীর মন হাল্কা করে দিয়ে ধোঁয়াটা বেরিয়ে গিয়ে আকাশে মিশে যায় না।

একটু সকাল সকাল সেদিন ফিরে আসে মিহির। থমথমে মুখ। কেমন যেন বিরক্ত বিরক্ত ভাব। আজ তো কোন চিৎকার নেই বস্তিতে। মানুষগুলো একেবারে নীরব। তাহলে? শরীর খারাপ হল নাকি?

মিহিরের কপালে হাত দিয়ে শরীরের তাপ পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয় রমা। জিজ্ঞেস করে, কি হল?

কোন উত্তর আসে না। উত্তেজিত পদক্ষেপে মিহির বেশ কিছু-ক্ষণ পায়চারি করে যায়। তারপর এক সময় নায়কের ভূমিকায় ছায়াচিত্রের বোকা অভিনেতার মতো রমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তার দৃষ্টিটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয় রমার।

একটু পরে আপনমনেই যেন গজগজ করে ওঠে মিহির, স্রেফ সুন্দরী বউ দেখিয়ে আই-এ পাশ দাশগুপ্তটা ডবল ইনক্রিমেণ্ট পেয়ে গেল আর আমি অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে কলার ছিবড়ে মুখে ঘষলাম।

মিহিরের কথা শুনে কান দুটো কটকট করে ওঠে রমার। এমন অভিযোগ এই প্রথম নয়। একেবারে স্পষ্ট করে না বললেও রমা এ ছটফটানির আসল অর্থ বুঝতে না পারার মতো বোকা মেয়ে নয়। অর্থাৎ যেহেতু সে সুন্দরী নয়, বা তেমন বলিয়ে কইয়ে চতুর মেয়ে নয় সেইহেতু অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হয় মিহিরকে এবং আপিসে উন্নতির পথটাও প্রশস্ত হয় না। এর পরই এসব কথা এসে পড়বে। দোষটা জোর করে রমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে মিহির। রুদ্ধ অভিযোগ প্রকট করে তুলবে।

আগে এসব কথা শুনলে রমা চুপ করেই থাকতো। মুখ বুজে দোষটা নিত নিজেরই ঘাড়ে। লজ্জায় এতটুকু হয়ে থাকতো। চেষ্টা করতো বলতে কইতে। রূপটা অবশ্য একেবারে পাল্টে ফেলতে না পারলেও ঘষে মেজে জৌলুস বাড়াবার চেষ্টা করত বৈকি।

যদিও কোন ফল হয়নি তাহলেও এতদিন তো তাই করে এসেছে রমা। চেষ্টার ত্রুটি হয় নি তার দিক থেকে। মিহির তার এই একক প্রচেষ্টা প্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ না করলেও।

আজ কিন্তু রমার অত অধ্যবসায় নেই। বরং কলহের বাসনাটা তীব্রতর হয়ে উঠছে। আর ভাল লাগে না কেবলই অক্ষমতা গোপন করবার স্থূল প্রচেষ্টা।

আস্তে আস্তে চেপে চেপে বলে রমা, তেমন একটা মেয়ে দেখে শুনে বিয়ে করলেই তো পারতে—এতই যখন অসুবিধা হয় তোমার আমাকে নিয়ে—

দাঁতে দাঁত চেপে সেই পুরনো ভঙ্গিতে মিহির বলে, কি হলে

কি হতে পারত সেসব যুক্তি তো ঠোঁটের আগায়। আমি কি তোমার মতো গুণবতী মেয়েকে ঘরে আনবার জন্যে তোমার বাবার পায়ে ধরেছিলাম ?

না। তিনিই শুধু তোমার পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলেন। সেসব কথা তো বহুবার বলেছ। পুরনো হয়ে গেছে। এবার নতুন কিছু শোনাও—

মিহির জবাব দেয় না। টাইটা টেনে খাটের ওপর ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু চেঁচায় না। মারতেও ওঠে না রমাকে। মনে মনে বোধহয় তাকে শোনাবার জন্যে কথা শানায়।

মিহিরের ভঙ্গি অনুকরণ করে রমাই কথা বলে আবার, তেমন গুণাবলীই যদি থাকতো আমার তাহলে তোমার মতো ছেলেকে বিয়ে করে এই বস্তির মাঝে এসে যে কিছুতেই উঠতাম না সে কথা বুঝতে পার না কেন ?

গলার স্বর অল্প একটু তোলে মিহির, কি করতে ? ফিল্মে নেমে রূপগুণ জাহির করতে বুঝি ?

কোন গুণ যখন নেই তখন চট করে বলতে পারব না ফিল্মে নামতাম কি প্রাসাদে উঠতাম, একটু থেমে রমা বলে, তবে দাম্ভিক কেরানীর বউ হয়ে খোঁটা খেয়ে যে জীবন কাটাতাম না সেকথা জোর করেই বলতে পারি—

বাধা দিয়ে চেঁচায় মিহির। কিন্তু পাকা বাড়ি। কথা ধাক্কা খায় দেয়ালে। বাইরে যেতে পারে না। একটি লোকেরও শান্তির ব্যাঘাত হয় না ওদের কথা কাটাকাটিতে।

মিহির বলে, দাশগুপ্তর বউ কাকে বিয়ে করেছে ? গাড়ি-বাড়ির মালিককে ? দাশগুপ্ত আমার চেয়ে সব দিক থেকে তিন কাঠি নিচে। দেখে এস একবার গিয়ে তার বউকে। মাথা ঘুরে যাবে। সকলেই তোমার মতো লোভী মেয়ে নয় যে শুধু গাড়ি

চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারলেই জীবন ধন্য মনে করে। বড় ঘরের মেয়ে হলে মনটাও বড় হয়—ওসব কথা তুমি কোনদিন বুঝতে পারবে না।

তাহলে ওসব কথা শোনাও কেন আমাকে? দাশগুপ্তর বউ-এর মতো মেয়ে বিয়ে করবার কম চেষ্টা করেছিলে নাকি তুমি? আমার কিছু জানতে বাকি নেই। যতই নিজের বাহাদুরীর কথা জাহির কর না কেন, আসল কথা বুঝতে দেরি হয় না আমার। দাশগুপ্তর বউএর মতো মেয়েদের কাছে আমল পাওনি বলেই বাবাকে দয়া দেখিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছিলে। অন্য কোথাও সুবিধা হলে তোমার মতো লোক বাবাকে লাথি মেরে বিদায় করে দিতে দ্বিধা করতো না সেকথা আমি জানি।

ছাই জান! দাশগুপ্ত পাত্তা পেতে পারে আর আমি পারি না?

না না না, বোধহয় মাথার ঠিক নেই রমার, নিজেই তো বলেছ দাশগুপ্তর বাবা জজ। ওদের গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বিরাট সাজানো সংসার আছে। আর তোমার কি আছে বলতে পার? কে আছে? মুখে জল দেবারও কেউ নেই। কি দেখে ভুলবে বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে? তোমার বিশ্রী মেজাজ দেখে—

মিহির হিংস্র মুখে এগিয়ে আসে রমার দিকে। দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে কড়কড় করে একটা শব্দ করে শুধু বলে, তবুও জেনে রাখ তোমার চেয়ে লাখো গুণে ভালো মেয়ে বিয়ে করতে পারতাম। ভুলে যেও না আমি ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির অনার্স গ্র্যাজুয়েট। অনেক বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে আমার মেশবার সুযোগ হয়েছিল আর, শাণিত হাসি হেসে মিহির শোনায়, তাদের কেউ কেউ যে আমার কদরও না বুঝেছিল তা নয়। ইচ্ছে করলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার। এখনও প্রমাণ মিলবে—

রমা কিছু বলবার আগেই গটগট করে আবার বেরিয়ে যায় মিহির। কোথায় কে জানে। জানতে চায়ও না রমা। যেখানে খুশি যাক। কিছুক্ষণ একা বসে শুধু চোখের জল ফেলতে চায় রমা। মিহির তাড়াতাড়ি ফিরে না এলে সে বেঁচে যায়। চোখের জল দেখিয়ে কারুর কাছ থেকে কৃপা ভিক্ষা করতে চায় না সে। তার স্বামীর মতো মানুষের কাছ থেকে তো নয়ই।

দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায় না সেদিন রমা। টেবিলে মুখ গুজে ঘরের মধ্যেই ফুলে ফুলে কাঁদে। তার ঠিক মনে পড়ে না কবে মিহিরের কাছে লোভ প্রকাশ করেছে সে। কবে গাড়ি চড়বার জন্যে বায়না ধরেছে আর বাড়ির জন্যে কাঙালপনা দেখিয়েছে।

কতক্ষণ ঠিক খেয়াল নেই, কেঁদে কেঁদে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল রমার। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ও। মিহির ফিরে এসেছে। জড়িয়ে ধরেছে রমাকে। আদর করছে ঘন ঘন।

আঃ ছেড়ে দাও—সজোরে ঠেলা মেরে মিহিরকে সরিয়ে দেয় রমা। চোখের জল শুকিয়ে গেছে তার।

ছেড়ে দেব? নিজের বউকে ছেড়ে কাকে ধরব বল? আর বলবে আমাকে কেরানী? কানাকে কানা বলো না। খোঁড়াকে খোঁড়া বলো না। কেরানী মাসের শেষে ছ পেগ হুইস্কি খাবার ক্ষমতা রাখে? মুখ থেকে কথা খসিয়েছি কি সঙ্গে সঙ্গে টাকা ধার। তোমার কথাও ভুলিনি, পকেট থেকে একটা এসেন্সের শিশি বের করে রমার দিকে এগিয়ে দিয়ে মিহির বলে, কে বলে আমি স্বার্থপর? এই দেখ এটা তোমার। কাছে এস ডার্লিং—রাঙিয়ে দিই, মিহির টলতে টলতে রমার কাছে এগিয়ে আসে।

থামো, মিহিরের হাত থেকে এসেন্সের শিশিটা নিয়ে মাটিতে

আছড়ে ভেঙে ফেলে রমা বলে, কচি খুকি আমি? জুতো মেরে খেলনা কিনে দিয়ে ভোলাতে এসেছ? ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির অনার্স গ্র্যাজুয়েটের তো এত কম বুদ্ধি থাকার কথা নয়—

ভাঙলে তো? দামী এসেন্সের শিশিটা? ইস্কুল মাষ্টারের মেয়ে কিনা। কদর বুঝবে কেমন করে। আমারই আট টাকা খরচ করা ভুল হয়েছিল—টান টান হয়ে খাটে শুয়ে পাশ ফেরে মিহির, কাছে এস, কাছে এস। কচি খুকি কাছে এস। তোমাকে ডল কিনে দেব, কত কি কিনে দেব। আদর করব। ভালবাসব। সারা রাত।

পট করে সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দেয় রমা। না হলে বকেই যাবে লোকটা। মদ খেয়ে এলে এমনি আবোলতাবোল বকে সারা রাত।

কিছুতেই খাটে শুতে পারবে না রমা। ঠায় চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দেবে। মিহির বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে নিশ্চয়ই। রমার গলা দিয়ে আজ কিছুই নামবে না। খাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই ওর।

বস্তিতে কিন্তু চিৎকার ওঠে সেই রাতেও। সেই বউএর গলা চিনতে রমার দেরি হয় না।

কে একটা মরা ইঁদুর ফেলে গেছে তার ঘরের কাছে। ওটা সকালে অন্নদার ঘরের সামনে পড়ে থাকতে দেখেছিল সে। দুর্গন্ধে ঘুম হচ্ছে না বলে অন্নদার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে বউ।

অন্নদাও কথা হজম করছে না মুখ বুজে। চিল-চিৎকারে উত্তর দিচ্ছে। চোখের মাথাখাওয়া বউটা কেন রাত-বিরাতে অন্নদাকে জ্বালায়। অন্নদা শত্তুর নাকি যে তার ঘরের সামনে মরা ইঁদুর ফেলতে যাবে। সে যে ওটা রাস্তায় নর্দমার পাশে দুপুরবেলা ফেলে এসেছিল তা দেখেছে যারা চোখের মাথা খায়নি তারা। নিশুতি

রাতে গলাবাজি না করে যমের বাড়ি গেলেই তো পারে বউটা। তাহলে হাড় জুড়োয় এখানকার বাকি মানুষগুলোর।

বউ কিন্তু এসব শুনেও থেমে যায় না। আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে।

ওদের ঝগড়ার প্রত্যেকটি কথা রাতের নিঝুম প্রহরে স্পষ্ট শুনতে পায় রমা। আর তারপর হঠাৎ একবার তাকিয়ে দেখে নিজের ঘরের দিকে।

কোন শব্দ নেই। দরজা জানালা মেঝে দেয়াল কী আশ্চর্য নীরব! একটা পিন পড়লে বোধ হয় শুনতে পাওয়া যায়। মরা ইঁদুরের দুর্গন্ধও নেই। বিদেশী এসেন্সের গন্ধে বিহ্বল হয়ে আছে সারা ঘর।

তবু ঘুম আসে না রমার।

শেষ অবধি মিহিরই বাধ্য হয়ে পুলিসে খবর দিল।

একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করা হচ্ছে, সে-দৃশ্য তো আর চুপ করে বসে দেখা যায় না।

সব ব্যাপার জানবার আগ্রহ মিহিরের মোটেই নেই। বাড়ি ফেরবার সময় অন্ধকারে সে দেখে একটা আধবুড়ো লোক মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে, আর একটা জোয়ান লোক তখনও তাকে মেরে চলেছে কিল-চড়-লাথি। মরেই বোধ হয় যাবে লোকটা।

বাড়ি ঢুকে জামাটা বদলে আবার বেরিয়ে গেল মিহির। রমা বুঝিয়ে বলল, কি দরকার তার এসব ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়বার। পুলিস নিজের থেকেই তো আসবে সাংঘাতিক রকম কিছু ঘটলে।

তার কথা কানে না তুলে মিহির বেরিয়ে পড়ল ট্রামলাইনের ধারে একটা ওষুধের দোকান থেকে পুলিসে টেলিফোন করতে।

যথাসময় পুলিস এল। উত্তেজনা। হৈ হৈ। তারপর সব চুপচাপ। শেষ অবধি দেখা গেল সেই বউটার স্বামীকেই ধরে নিয়ে গেল পুলিস। যাকে প্রহার করা হচ্ছিল, সে অবশ্য মরেনি। তবে প্রায় মর মর অবস্থা। তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করল পুলিস।

স্বামীকে পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে উঠল না বউ। বরং পাঁচজনকে শুনিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, বিনাদোষে শুধু শুধু ধরে নিয়ে গেলেই হল। দেখা যাক কদিন আটকে রাখে। জামিন দাঁড়িয়ে খালাস করে আনবার মানুষ নেই নাকি এখানে? সরকারের ভাগ্যি ভাল যে একেবারে অক্কা পায়নি। রোগা-পটকা হলে হবে কি, গায়ে জোর আছে টেঁপির বাবার। কলে খাটে না সে?

টেঁপির বাবা মানে বউএর স্বামী। যা হোক আসল ব্যাপার একটু পরে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। রমাও সব কাহিনী শুনল ঝিয়ের কাছ থেকে।

বস্তির মালিকের আধবুড়ো সরকার ভাড়া আদায় করতে আসে মাসের মধ্যে অনেকবার। সকলের কাছ থেকে ভাড়া ঠিক সময় পায় না বলেই তাকে বারবার আসতে হয়। বউএর সঙ্গে সেই সূত্রে কথাও বলে। হাসে। আলাপ জমায়। ভাড়া অনেক কমিয়ে দেবার আশ্বাসও নাকি দেয়। আকারে-ইঙ্গিতে প্রশংসা করে বউএর—রূপবর্ণনাও করে। তাকে বস্তির এ ঘরে মানায় না, এমন কথাও বলে।

এমনি করেই কিছুদিন ধরে চলছিল। ভাবভঙ্গী ভাল না লাগলেও কথা শুনে গেছে বউ, মানে না বুঝে। আধবুড়ো সরকার। তার বাপের বয়সী। রসিকতা বলেই ধরে নিয়েছে তার কথাবার্তা।

স্বামী ফেরেনি তখনও। সন্ধ্যে হয় হয়। ভাড়া আদায়ের কাজে এল সরকার। বউটার সঙ্গে কথা বলল। যেমন বলে তেমন। ভাড়া অনেক কমিয়ে দেবার আশ্বাসও দিল। তারপর আধো অন্ধকারে হঠাৎ সব ভুলে একটা ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বউএর ওপর। সে একাই মুক্ত করে নিতে পারত নিজেকে, কিন্তু ঠিক সেই সময় তার স্বামী এসে ঘরে ঢুকল।

মোটামুটি ঘটনাটা হল এই। আর ঠিক এমনি করেই থেমে থেমে পুলিসকে একে একে সব কথা গুছিয়ে বলল বউ। কিন্তু তবু তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস।

সরকার নয়, বাড়িওলা মণি বাবু স্বয়ং আবার এল মিহিরের কাছে। মাসের দশ তারিখ হয়ে গেল। এখনও ভাড়া দিতে পারেনি মিহির। এ মাসে কবে দিতে পারবে ঠিক নেই। প্রায় দেড়শ টাকা ধার শোধ করতে হয়েছে তার।

কিন্তু প্রথম মাস থেকেই এমন করলে লজ্জার কথা বৈকি। মণি বাবুর কাছে মান থাকে না মিহিরের। ভাড়া তো এই গোটা বাড়িটার মোটে একশ কুড়ি টাকা।

প্রথম সপ্তাহেই মিহির চিঠি পেয়েছিল মণি বাবুর। মৃদু তাগাদা দিয়ে লিখেছিল। এই বাড়ি ভাড়ার ওপর নির্ভর করেই তার নাকি সংসার চলে। কাজেই প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ভাড়াটা দয়া করে মিহির চুকিয়ে দিলে অনেক সুবিধা হয় তার।

সে-চিঠির কোন উত্তর না পেয়ে মণি বাবু নিজেই এসেছিল মিহিরের কাছে আর একবার। মিহির লজ্জিত হয়ে তাঁকে বিনীত-ভাবে জানায় যে, ব্যাঙ্কের গোলমালের জন্যেই তার এই বিলম্ব। একটা মোটা চেক আটকে আছে বলে তার নিজেরও অসুবিধা

হচ্ছে খুব। যা হোক, দশ তারিখে সে নিশ্চয়ই ভাড়া চুকিয়ে দেবে।

তাই দশ তারিখ সকালেই আবার এসে উপস্থিত হল মণি বাবু। আর মিহির বিরক্ত হল মনে মনে। ভাবতে লাগল কি বলে লোকটাকে আজও বিদায় করা যায়। কিন্তু মণি বাবুর মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না মিহিরের।

মিহিরের অবস্থাটা ভাল করেই বুঝতে পারে রমা। তবু কোন কথা বলে না। সে জানে কিছু বলতে গেলেই মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠবে মিহির। সব দোষ যেন রমার।

খুব আস্তে অসহায় শিশুর মতো বলে ওঠে মিহির, তুমি একবার নিচে যাবে নাকি রমা ?

আমি গিয়ে কি করব ?

লোকটাকে বিদায় কর। ব্যাঙ্ক-স্ট্রাইক দেখিয়ে বল, আর কষ্ট করে আসতে হবে না। হাঙ্গামা মিটলেই আমরা ভাড়াটা পাঠিয়ে দেব—

যেন লাখ টাকা তোমার ব্যাঙ্কে পচছে, রমা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, কথাটা তুমি নিজে গিয়েই তো বললে পার মণি বাবুকে ?

হঠাৎ বিরক্ত হয় মিহির, তা পারলে আর তোমাকে বলতে বলব কেন ? ওসব গাঁইয়া লোক মেয়েদের কথার একটু বেশি মূল্য দেয়। আমার উন্নতির জন্যে কিছুই তো করবার ক্ষমতা নেই তোমার। একটা বাড়িওলাকেও যদি মাসখানেক ঠেকিয়ে রাখতে না পার—

যাচ্ছি যাচ্ছি, মিহিরের মনের ভাব বুঝতে পারে রমা, কিন্তু আসছে মাসে দু মাসের ভাড়া এক সঙ্গে দেবে কোথা থেকে ?

সেকথা ভেবে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না—একি ওই নোংরা শাড়িটা পরেই যাবে নাকি নিচে ? কী আশ্চর্য, মুখে পাফটা

একবার বুলিয়ে যাও। এক মাস বাড়িভাড়া বাকি রাখা সোজা ব্যাপার নাকি তুমি ভাব আজকাল কলকাতা শহরে ?

দোতলার সেই বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রমা। রাস্তার কলে বস্তির একপাল ছেলেমেয়ের ভিড়। শুধু একটা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে কচি রোদ্দুরে বউ তেল মাখাচ্ছে একমনে বাচ্চাটাকে। ফিক ফিক করে হাসছে বাচ্চাটা। লজ্জায় চোখ বন্ধ করছে। সুড়সুড়ি লাগছে বোধ হয়।

আত্মতৃপ্তির সংজ্ঞার্থ জানে না রমা। তবে মনটা আজ ওর প্রসন্ন হয়ে আছে বটেই। এতদিন পর স্বামীর কাজে লাগতে পেরেছে সে। আপিসে বেরুবার আগে রমার পিঠ চাপড়ে তাকে বাহবা দিয়ে গেছে মিহির।

কৌশলে বুদ্ধিমতী মেয়ের মতোই কাজ গুছিয়ে নিতে পেরেছে রমা। শাড়ি বদলেছিল। পাউডারের পাফও বুলিয়েছিল মুখে মিহিরের কথামতো। মণি বাবু আর ভাড়া চাইবে না এ মাসে।

তবে আসবে বৈকি মণি বাবু এ বাড়িতে মাঝে মাঝে। রমা যখন এমন আশ্চর্য আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারল। আরও কত ভাড়াটে ছিল এর আগে এ বাড়িতে। কিন্তু তারা কেউ রমার মতো এমন ভদ্র ব্যবহার করেনি বাড়িওলার সঙ্গে। দেনাপাওনার সম্পর্ক ছাড়াও মানুষে মানুষে অন্য একটা ব্যাপক সম্পর্ক আছে তো। অন্য ভাড়াটেদের সেকথা বোঝবার মতো বুদ্ধি ছিল না। মণি বাবু অনেকক্ষণ ধরে সেসব কথাই শোনাল রমাকে।

ব্যাঙ্কের গোলমালের কথা রমাকে শেষ করতে দিল না মণি বাবু। হবেই তো মানুষের অসুবিধা—বিশেষ করে রমাদের মতো ভদ্র-পরিবারের মানুষদের। মণি বাবু তো আর অবুঝ নয় যে সেসব কথা বুঝবে না।

কিন্তু খালি অসুবিধার কথা শুনিয়ে শুধু মুখে মণি বাবুকে বিদায় করেনি রমা। যত্ন করে চা-মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছে তাকে। রমার আন্তরিকতার নিখুঁত অভিনয়ে বাড়িওলা গদ গদ হয়েছে খুশিতে। তাদের মতো ভদ্রলোকের কাছে ভাড়ার তাগাদা দিতে এসেছে বলে বারবার লজ্জা প্রকাশ করেছে।

কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে আত্মতৃপ্তির সুখটা হঠাৎ বিকট হয়ে ওঠে রমার মনের মধ্যে। ঘন ঘন কাঁটা ফোটায়। হেমন্তের তাজা রোদ্দুরের আঁচটা অস্বাভাবিক রকম কড়া মনে হয়। আর চোখে একটু জলও চিক চিক করে ওঠে বোধ হয়।

ওদিকে বস্তিতে হঠাৎ কোলাহল জাগে। বউ ছুটে এসে বাইরে দাঁড়ায়। জামিনে খালাস পেয়ে সদলবলে হৈ হৈ করতে করতে ফিরে আসে তার স্বামী।

রমা ঠিক বুঝতে পারে না বস্তির মালিকের সেই আধবুড়ো সরকার এখনও বেঁচে আছে কিনা।

৩রা নভেম্বর : ১৯৫৭

রবিবার সকাল : কলিকাতা

॥ অভ্যন্তর ॥

এমনি করেই চলেছে।

ভাল করে সন্ধ্যে হয় নি। একটু একটু আলো আছে। আপিস-ফেরৎ বাবুদের ভিড় কমে গেছে তখন। রাস্তায় লোক থাকলেও তত ব্যস্ততার সাড়া নেই কোথাও।

আস্তে আস্তে অতসী এসে রিক্সর কাছে দাঁড়াল।

তারপব চারপাশে তাকিয়ে রিক্সওয়ালাকে বলল, খুব আস্তে আস্তে ডান দিকের রাস্তা ধবে সোজা চল, একটু নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসল অতসী।

আগে আগে আর একজন হেঁটে চলেছে। অতসী তাকে ট্রাম থেকে নামতে দেখেছে। বয়স বেশি নয় লোকটির। তিরিশ—বত্রিশ হবে। আর চেহারা দেখেও খুব চালাক চতুর মনে হয় না।

ঠিক এইরকম লোক দরকার অতসীর।

রিক্সওয়ালা আস্তে—

সেই লোকটির পাশে রিক্স দাঁড় করিয়ে বিব্রত স্বরে অতসী জিজ্ঞেস করল, ল্যান্সডাউন মার্কেট কোন দিকে হবে দয়া করে বলতে পারেন ?

মেয়ের স্বর শুনে লোকটি থমকে দাঁড়াল। তারপর অতসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিনীত স্বরে বলল, বেশি দূরে নয়, একেবারে সোজা চলে যান। ওই যে দেখছেন ল্যান্সডাউন রোডের মোড়, ওখান থেকে বাঁ দিকে একটু গেলেই ল্যান্সডাউন মার্কেট পাবেন—

লোকটি আর কি বলতে যাচ্ছিল। তার কথা শেষ হবার আগে অসহায়ের মতো অতসী বলল, ওমা, বড় অন্ধকার হয়ে গেল যে। আমি এদিকে কখনও আসি নি, কাউকে চিনি না, একটু থেমে লোকটির মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে সে আবার বলল, ওদিকেই যাচ্ছেন তো আপনি, আমাকে দয়া করে একটু পৌঁছে দেবেন ?

কি ভেবে ইতস্তত করে অবশেষে লোকটি বলল, চলুন।

আসুন, রিক্সয় উঠে পড়ুন।

না না আমি হেঁটেই যাচ্ছি।

ওমা, সে কি হয় ? আপনি শুধু শুধু আমার জন্যে কষ্ট করবেন কেন ? আসুন অনেক জায়গা আছে, অতসী একধারে সরে গিয়ে লোকটিকে বুঝিয়ে দিল স্থানাভাব হবে না।

তাকে রিক্সয় তুলে নিশ্চন্ত হল অতসী। শুধু এটুকু করতে তাকে যা বেগ পেতে হয়। সহজে লোকে রিক্সয় উঠতে চায় না। না তার চেহারা দেখে হীন সন্দেহ করবার দুঃসাহস নেই কারুর। একজন অচেনা মেয়ের পাশে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে ভদ্র-লোকের সঙ্কোচ হয় বৈকি।

ভদ্র বাড়ির বউ বলে অতসীকে প্রথম দৃষ্টিতে লোকের মনে হয়। শান্ত গম্ভীর চেহারা তার। কপালে লাল টিপ, মাথায় ঘোমটা আর পরণে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। কোন কোনদিন মাথায় ঘোমটা থাকে না অতসীর। সিঁদুরের রেখাও সিঁথিতে দেখা যায় না। সেদিন তাকে দেখে কলেজের ছাত্রী বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

রোজ এক জায়গায় নয়। স্থান পরিবর্তন অতসীকে প্রায়ই করতে হয়। সোমবার হাজরা রোডের মোড়ে, মঙ্গলবার জগু-

বাজারের কাছে, আর একদিন লেক রোডে তারপর দক্ষিণ কলি-কাতার মোড়ে।

সব লোক চেহারা চিনে ফেললে ক্ষতি হয় তার। তবে বিচলিত হয় না সে। তার নিজের মানুষের চেহারা মনে রাখবার ক্ষমতা অসাধারণ। আজ অবধি এক লোককে সে কখনও দু বার রিক্সয় তোলে নি।

কিছুদূর যাবার পর আজকের লোকটি কথা বলল, ল্যান্সডাউন মার্কেটের কাছে কোথায় যাবেন আপনি ?

হেসে তার একটা হাত ধরে অতসী বলল, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।

আমি ? লোকটি অবাক হল, আমি কোথায় নিয়ে যাব আপনাকে ?

সেকথা আমি কি জানি ? নিয়ে যাবার জায়গা না থাকলে রিক্সয় তুললেন কেন আমাকে ?

আমি আপনাকে রিক্সয় তুললাম ?

বাজে কথা বলবেন না। পকেটে যা আছে ভালয় ভালয় দিয়ে দিন, আমি চলে যাচ্ছি।

কি দিয়ে দেব আপনাকে ? অতসীর কথা শুনে সেই ভাল মানুষের চেহারা বদলে গেল হঠাৎ, আপনাকে আমি পুলিশে দেব, এই রিক্স থানামে চল—

চলুন থানায়, অতসীও তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, আপনার মত ভদ্রলোক আমার অনেক দেখা আছে। পকেটে যা আছে যদি না দেন তাহলে আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব। সে সত্যি চেঁচিয়ে উঠল, ও মশাইরা শুনছেন—

তর্কাতর্কি আরম্ভ হতে রিক্সওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়ল। এদের ভাষা বুঝতে না পারলেও দৃশ্যটি সে বেশ উপভোগ করছে মনে হল।

কিন্তু লোকটি রিক্স থেকে নামবার আগে অতসী শক্ত করে তার হাত চেপে ধরল।

হাত ছাড়ুন!

পকেটে যা আছে দিন আগে—

আর একটু পরেই লোক জমতে আরম্ভ করবে। দূর থেকে দু একজন তাদের লক্ষ করছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পাড়াটা ভাল নয়।

কোন উপায় না দেখে লোকটি বলল, কত চাই?

দশ টাকা।

অত টাকা নেই আমার কাছে।

কেন মিথ্যা কথা বলছেন? তার বুকপকেটের দিকে ঝুঁকে পড়ে অতসী বলল, ওই যে দেখা যাচ্ছে, থানায় গেলে কিন্তু সব কটা নোটই দিতে হবে।

আর কোন কথা না বলে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে অতসীর হাতে দিয়ে লোকটি হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আর নোট বুকে গুঁজে আপন মনে হেসে অতসী রিক্সওয়ালাকে বলল, চল ট্রাম রাস্তা—

এমনি করেই চলে অতসীর। এমন করে যখন আর চলবে না তখন তাকে উপোস করতে হবে। এ ছাড়া আর কিই বা করবে সে! আর কিছু তার করবার নেই। অনেক কিছু করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে তবে সে এ কাজ বেছে নিয়েছে।

সব দিন অবশ্য রিক্স করবার দরকার হয় না অতসীর। মাঝে মাঝে সে মোটর গাড়িও চড়ে। মোটর গাড়ির কথা ভাবতেই অতসীর সে সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে যায়। নিজের বাহাদুরীর কথা ভেবে নিজেকেই সে বাহাবা দেয় মনে মনে।

জগু বাজারে কোন বড় মণিহারি দোকানের সামনে সেই মোটর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। বোধ হয় বৈশাখের আরম্ভ। অতসীর ঠিক মনে পড়ে না। সে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিল। হঠাৎ ঝড় এলো। আর কোন দিকে না তাকিয়ে ছুটে এসে অতসী দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সেই গাড়ির মধ্যে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যার গাড়ি সেও এসে বসল সামনে। তখনও সে বুঝতে পারে নি পিছনে আর একজন বসে আছে।

দোকান থেকে সদ্য কেনা জিনিসগুলো পিছনে রাখতে গিয়ে চমকে উঠে সেই ভদ্রলোক বলল, আপনি কে ?

মাপ করবেন, যেন খুব লজ্জা পেয়ে অতসী কথা বলল, যা ঝড় এসে পড়ল, আপনার অনুমতি না নিয়েই গাড়িতে উঠে পড়লাম। আমি হাজরা রোডে ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের কাছে যাব। দয়া করে পৌঁছে দেবেন ?

নিশ্চয়ই, ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলল, আমিও তো ওই দিকে যাব, মোটরে সে স্টার্ট দিল।

আর কোন কথা বলল না কেউ। পুরু গদিতে আরামে অতসী ঠেস দিয়ে বসল। ভদ্রলোক নিতান্ত ভাল মানুষ। একে জব্দ করতে বেশি সময় লাগবে না তার। বরং কিছু বেশি পাওয়া যাবে। দু পাঁচ টাকার বেশি সহজে কারুর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তাও মাসের প্রথম দিকে। মাসের শেষ দিকে সকলেরই শূন্য পকেট। অনেক সময় রিক্স ভাড়াও আদায় করতে পারে না অতসী। ওর পণ্ডশ্রম হয় শুধু।

কত রকম লোক যে আছে কলকাতা শহরে! কেউ কেউ আবার মুস্কিলেও ফেলে তাকে।

রিক্সয় যেতে যেতে তর্ক আরম্ভ হলে বলে, বেশ মিথ্যা দুর্নাম দিয়ে যখন টাকা চাও তখন চল আমার বাড়ি ?

অনেক টাকা লাগবে।

যা চাও তাই পাবে চল।

অতসী থেমে থেমে বলে, ও ব্যবসা আমার নয়।

তাহলে মানুষকে বোকা বানাও কেন ?

অতসী কখনও কোথাও যায় না ! এমন তর্কাতর্কি হলে সে চিৎকার করে লোক জড়ো করে বলে, দেখুন মশাই, আমার সর্বনাশ করতে চায়, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে—

রিক্স থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটি বলে, কিসের ভদ্রলোকের মেয়ে ? চল থানায়—

লোকটা একটু অন্য প্রকৃতির যেন ! সত্যি থানায় যেতে পারে। পুলিশের নামে পিছিয়ে যায় অতসী। একবার পুলিশের চোখে পড়লে অসুবিধা হবে তার। তাই আর কথা না বলে সে রিক্সওয়ালাকে এগিয়ে যেতে বলে আর আপন মনে বিড়বিড় করে। অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে রিক্স থেকে মুখ বাড়িয়ে সে দেখে আরও অনেকের সঙ্গে সেই লোকটি তখনও জটলা করছে।

করুক। কি এসে যায় অতসীর। এ পাড়ায় আর কখনও আসবে না সে।

হাজরা রোডে ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল, এবার কোন দিকে যাব ?

প্রশ্ন শুনে অতসী হাসল। হঠাৎ কোন উত্তর দিল না। ঝড় থেমে গেছে তখন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় আবার লোক চলাচল আরম্ভ হয়েছে।

অতসী বলল, কোন দিকে যাবেন ? যেদিকে আপনার ইচ্ছে। আমি সব দিকে যেতে রাজি।

ভদ্রলোক পিছনে তাকিয়ে বলল, কি বলছেন, আপনি একটু আগে তো বললেন ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের কাছে পৌঁছে দিতে ?

বাজে কথা বলবেন না! আপনিই তো ভাল ভাবে সময় কাটাবার জন্যে আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। এখন নিয়ে চলুন যেখানে আপনার খুশি।

অতসীর কথা শুনে বোধ হয় ব্যাপার বুঝতে পেরে ভদ্রলোক সশব্দে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বলল, নামুন এখুনি আমার গাড়ি থেকে, নাহলে আমি পুলিশে খবর দেব।

ব্যঙ্গ করে অতসী বলল, হুঁ ? বেশ চলুন ভবানীপুর থানায়। দেখা যাক পুলিশ কার কথা বিশ্বাস করে, ভদ্রলোকের আপাদ মস্তক একবার সে ভাল করে দেখে নিল। না, মুখে যতই চেঁচামেচি করুক, থানায় যাবার লোক এ নয়। তেমন চাপ দিতে পারলে বেশ মোটা টাকা বেরোবে এর পকেট থেকে।

গাড়ির মধ্যে বেশ ভাল করে বসে আবার অতসী বলল, যদি এখানেই আমাকে ছেড়ে দিতে চান তাহলেও আমার কোন আপত্তি নেই। বলুন আমি নেমে যাই ?

হ্যাঁ, নামুন আপনি।

বেশ, পঁচিশ টাকা বের করুন।

কী ?

ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? দামী জামা কাপড় পরেন, গাড়ি চড়েন, আপনি বড় লোক, আমাকে পঁচিশ টাকা দিতে এত ভাবছেন কেন ? আর না দিলে আমি ছাড়ছি না আপনাকে। গাড়ি থেকে আমি নামব না কিছুতেই—

বেশ থাকুন আপনি বসে, আমি চললাম—

ভদ্রলোককে সত্যি চলে যেতে দেখে অতসী চিৎকার করে উঠল, ও মশাই আমাকে একা ফেলে রেখে পালাচ্ছেন কোথায় ? আচ্ছা লোক তো আপনি ! ও মশাই—

রাস্তার একজন গাড়ির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ?

হবে আবার কি ? ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করুন।

ভদ্রলোক একটুও বিচলিত না হয়ে যা ঘটেছিল তাই বলল। এবং জানাল গাড়ি এখানে রেখে সে থানায় যাচ্ছে পুলিশের সাহায্য নিতে। এসব মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

অতসী বলল, যান মশাই পুলিশ নিয়ে আসুন। দেখি আপনি কেমন ভদ্রলোক। এতগুলো লোকের সামনে মিথ্যা কথা বলতে লজ্জা করছে না আপনার ? কোট প্যাণ্ট পরলেই ভদ্রলোক হয় না। দেখি টাকা না মিটিয়ে আপনি কেমন করে যান।

লোক জমতে লাগল দেখতে দেখতে। দু একজন রাস্তার ছোকরা টিটকিরি দিতে আরম্ভ করল ভদ্রলোককে। গাড়িতে দুমদাম লাথি মারল।

ব্যাপার দেখে এবার বেশ ঘাবড়ে গেল ভদ্রলোক। সে ভেবে পেল না এতগুলি লোকের সামনে অতসীকে নিয়ে কি করবে।

এক বুড়ো ভদ্রলোক তার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনার কথাই হয় তো সত্যি। কিন্তু মেয়েটি যা চায় দিয়ে বিদায় করে দিন। ঝামেলা বাড়াবেন না। থানা পুলিশ করবার হাঙ্গাম অনেক। আপনি ভদ্রলোক। কাগজে পত্রে এসব বেরোলে কুৎসা রটবে শুধু।

কি আর করা যায়। অগত্যা পঁচিশ টাকা অতসীর হাতে দিয়ে তবে সে তাকে গাড়ি থেকে নামায়।

তারপর রাস্তায় মোটর গাড়ি দেখলে অতসী অমন করে আরও অনেকবার চড়তে গেছে। কিন্তু দরজা খুলতে পারে নি কিছুতেই।

যার গাড়ি সে চাবি দিয়ে গেছে। লোকগুলো এত চালাক হয়ে গেলে কেমন করে চালাবে অতসী!

এ মাসে বেশি আয় করতে পারে নি অতসী। আর কতদিন রোজ সন্ধ্যায় এমন করে লোক ঠকানো যায়। আজকাল মাঝে মাঝে নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয়। একদিন অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে পরদিন কি খাবে জানে না। অমন কত দিন তার না খেয়ে কেটেছে। পর পর তিন চারদিন এক পয়সাও রোজগার করতে না পারলে বাসের তলায় পড়ে অতসীর মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কি হবে এমন করে বেঁচে থেকে। আরও অনেক কিছু করবার চেষ্টা করেও তার অবস্থা ভাল হয় নি। নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। তার চেয়ে এখন যা করছে সেটাই তার সব চেয়ে ভাল মনে হয়।

যা হোক আজ সে দশ টাকা পেয়েছে। এখন দু একদিন বিশ্রাম করতে পাবে সে। কয়েক দিন থেকে শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না তার। মাথা ঘোরে, দেহ টলে, ঘুম ভাঙলে সকালে উঠতে কষ্ট হয়। বয়সও তো কম হল না। এমন ছুটোছুটি করা কি পোষায় মেয়ে মানুষের।

বাঁশপট্টি লেন পেরিয়ে ডান দিকে একটা ছোট গলির মধ্যে অতসী ঢুকল। বড় অন্ধকার। সাবধানে পথ চলতে হয়। রাতে চোখে ভাল দেখে না সে। মা বলে, ছেলেবেলা থেকেই সে নাকি রাত কানা।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল অতসী। সে এসেছে বুঝতে পেরে ঠুক ঠুক করে শৈলবালা তার পাশে এসে দাঁড়াল। অতসীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, বলি আজও কি কিছু মেলে নি রে?

মার কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল অতসীর। ঢুকতে না

ঢুকতেই শুরু হবে কাঁদুনি। মরেও না বুড়ি। সাধে কি অতসী নিজে মরে যেতে চায়।

শৈলবালার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সে শাড়ি বদলাতে লাগল। আজ কেচে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর কাল শুকোবার পর বেশ জোরে চেপে ঠিক করতে হবে। শাড়িটা ময়লা হয়েছে। ওটা পরে আর ভদ্র সেজে রাস্তায় বার হওয়া চলে না।

শৈলবালা অতসীর আরও কাছে সরে এল। বাড়িওলা এসেছিল, খুব দাপট দেখিয়ে গেল, বুঝলি রে আতু? তুই তো বাইরে বাইরে ঘুরিস। কিন্তু আমি কাঁহাতক আর মুখপোড়ার কথা শুনব?

মার মুখের দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় অতসী বলল, এসব কথা দু মিনিট পরে বলতে পার না?

মুখ করিস কেন রে? বলি মেজাজ কাকে দেখাস তুই?

মেজাজ দেখাব না তো কি সোহাগ করব? খেটেখুটে আসতে না আসতে প্যান প্যান আরম্ভ করলে—

উঃ, কী আমার খাটিয়ে মেয়ে রে! কি করে এলি তা আমার জানতে বাকি নেই! তাও যদি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘরে আনতিস তা হলে ভিন্ন কথা ছিল—

বক বক কর না, যাও এখান থেকে।

বলি যাব কোথায়? তোর মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব? অত ঘোরাঘুরি করেও তো ভাড়ার টাকা দিতে পারিস না—কী আমার রূপসী মেয়ে রে!

তোমার মতো মা যার তার টাকা থাকবে কেমন করে?

তোর টাকা আমি চুরি করি?

কি দরকার তোমার রোজ রোজ রিক্সা ভাড়া করে কালীঘাটে যাবার?

কি? শৈলবালা হঠাৎ হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল,

আমি মায়ের বাড়ি যাই বলে কথা শোনাচ্ছিস? মুখে পোকা পড়বে তোর—

কেন কথা শোনাব না? তীক্ষ্ণ স্বরে অতসী বলল, সংসারে যখন এত অভাব তখন রোজ রোজ অত পয়সা খরচ করে কি দরকার তোমার মায়ের বাড়ি যাবার?

শৈলবালার চোখের জল শুকিয়ে গেল, বুঝিস না তোর পাপ কাটাতে যাই? খেয়াল আছে, ভবিষ্যতে গতি হবার ঠাঁই নেই তোর? যাবি কোথায় তুই?

আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। এমন মা যার তার মেয়ে অন্য রকম হবে কেমন করে? মরতে পার না তুমি? মরে আমাকে রেহাই দাও—

আবার কেঁদে উঠল শৈলবালা, ওগো কে কোথায় আছ শোন কথা, ডাইনি মেয়ে কি বলে আমাকে! বলি কতটুকু খাই আমি রে? খালি লোককে দূর করে দিতে জানিস তুই। সতী হলে কি আমার অমন জামাইকে ভাদ্র মাসে তাড়াস। কোথায় গেলে বাবা বিশু, একবার এসে তোমার বউএর কথা শোন—

থাম, যা-তা বলে চেঁচিও না। বেশ করেছি, আমার যাকে খুশি আমি তাড়িয়েছি। এক পয়সা রোজগার করবার যার ক্ষমতা নেই তার নিরুদ্দেশ হওয়াই ভাল। যেমন অকর্মা তুমি তেমন তোমার সোহাগের জামাই, অতসী শাড়ি গুটিয়ে সশব্দে বালতি তুলে নিয়ে সেই অন্ধকারে কলতলায় গেল।

মাঝ বয়সী লোক। এককথায় অতসীর রিক্সয় উঠে পড়ল। একে নিয়ে বোধ হয় খুব বেশি অসুবিধা হবে না। তবে বোঝা যাচ্ছে না পকেটে কত আছে লোকটার। অতসী তার আরও কাছে সরে এসে বসল।

আমি তো যাব গবচা লেনে, আপনি ?

লোকটি হেসে বলল, বণ্ডেল রোড, আপনার রিক্সয় উঠে ভাল হল, তা না হলে অত দূর হাঁটতে হত আমাকে। আপিসের পর হাঁটতে ইচ্ছে করে না--

বাসে উঠলেই তো পারতেন, অতসী নরম গলায় বলল।

বাস ? যা ভিড় ! একটু চুপ করে থেকে লোকটি আবার বলল, মাসের শেষে এতটা পথ হাঁটতেই হয় আমাকে।

কেন ?

বুঝতেই তো পারেন, গরিব কেরানী। কথায় কথায় গাড়ি ঘোড়া চড়লে আমাদের চলে না।

অতসী জিজ্ঞেস করল, খুব বড় সংসার বুঝি আপনার ?

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটু পরে অতসীর দিকে ম্লান মুখে তাকিয়ে বলল, না খুব ছোট সংসার আমার। শুধু আমি আর আমার সাত বছরের খোকা।

আর খোকার মা ?

সে থাকলে তো ভাবনা ছিল না আমার, আকাশের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে লোকটি বলল, গত বছর এই সময় কলেরায় শেষ হয়ে গেল সে—আর খোকাও বুঝি তার কাছে যেতে বসেছে।

কেন ? কি হয়েছে খোকার ?

বুঝতে পারছেন না ? মাসের শেষ। টাকাও নেই হাতে। কোন রকমে সামান্য ধার করেছি আজ। সকালে ডাক্তার দেখে গেছে। যাবার সময় পাড়ার দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে যাব—

কথা শুনে অতসী খুশি হল। যাক একেবারে শূন্য পকেট নয় লোকটির। জামা কাপড়ের অবস্থা দেখে মনে হয় না পকেটে কিছু আছে। এই রকম ভাল মানুষের যদি পকেটে কিছু থাকে তাহলে রোজ সন্ধ্যে বেলা ভাবনা হয় না অতসীর।

কী আশ্চর্য লোক, এক কথায় কাঁদুনি গাইতে আরম্ভ করেছে! কে চায় ওর সংসারের দুঃখের খবর শুনতে!

কৌশল করে অতসী তার আরও কাছে বসে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ওই বাড়িটা কাদের জানেন?

কোনটা?

ওই যে দূরে—সেই সুযোগে ভাল মানুষটির পকেট থেকে একটা খাম তুলে নিল অতসী।

ছেলের অসুখের জন্যে ধার করা টাকা তো আছে এর মধ্যে। ওতেই কাজ চলে যাবে তার। বড় গোবেচারা লোকটি। এর সঙ্গে তর্ক করতে গেলে হয়তো অতসীর পায়ে পড়ে কাঁদতে পারে। সেসব হাঙ্গামের চেয়ে এই বেশ ভাল হল।

লোকটি বলল, না, ও বাড়ি আমি চিনি না।

আর চেনবার দরকার নেই। মনে মনে হাসল অতসী।

আজ না বার হলেই ভাল হত। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে অতসীর। থেকে থেকে নিদারুণ তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু না বেরিয়ে উপায় ছিল না। একটি পয়সা নেই বাড়িতে। বুকে হাত দিয়ে আর একবার সেই ভদ্র লোকের পকেট থেকে তুলে নেওয়া খাম অনুভব করল সে। কত আছে ওটার মধ্যে তা দেখবার অতসীর ইচ্ছে নেই। এখন কোন রকমে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়তে পারলে সে বেঁচে যায়। ওই খাম তার সম্বল। সেটি আবার না পড়ে যায়।

ঘর অন্ধকার। শৈলবালা বাড়ি নেই। কোথায় যায় বুড়ি এই অন্ধকারে! আলো জ্বালল না অতসী। হাতড়ে হাতড়ে বিছানা টেনে গড়িয়ে পড়ল। চোখের পাতা মেলতে পারছে না সে কিছুতেই। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়।

আতু, ওমা আতু, কীর্তন শুনে অনেক রাতে ফিরে এসে ডাকল শৈলবালা। মেয়ের সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে চমকে সরে এল।

অতসীর গা থেকে যেন আগুন বার হচ্ছে।

না, পাশে কেউ নেই।

খুব ভোরে চোখ মেলে অতসী পাশ ফিরে দেখল। তাহলে কেন সারা রাত ধরে রিক্সর সেই ভাল মানুষ লোকটি তাকে অমন করে অভিশাপ দিয়ে গেল! সে তো নেয় নি তার খোকাকে।

মা, ও মা—শৈলবালার সাড়া পাওয়া গেল না।

বুকের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে সেই খাম বের করে দেখল অতসী।

কয়েক আনা পয়সা, একটা ভাঁজ করা কাগজ আর পাঁচ টাকার নোট একটা।

ইংরেজি জানে না অতসী। তবু সেই ভাঁজ করা কাগজ খুলে সে বুঝল ওটা ডাক্তারের লেখা। বোধ হয় খোকার ওষুধের নাম।

সেটা হাতে চেপে ধরে শৈলবালাকে আরও জোরে ডাকল অতসী।

কি রে? চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে এল শৈলবালা, চেঁচাস কেন সকাল বেলা?

খুব আস্তে ভয়ে ভয়ে অতসী বলল, কালীঘাটে যাবে না আজ?

কেমন করে যাব? একটা পয়সা নেই বাড়িতে। ওমা, দেখি দেখি, তোর চোখ বড় লাল হয়েছে রে—কাল খুব জ্বর ছিল! হেবো ডাক্তারকে একটা খবর দিই, কি বলিস?

না, আপন মনে যেন অতসী বলল, আমি টাকা দিচ্ছি, একটু

ভোর ভোর তুমি কালীঘাটে যাও। এই পাঁচ টাকা নাও। পুজো দিয়ে বলবে খোকার অসুখ যেন সেরে যায়—

খোকা? বলিস কি রে?

আমার জ্বর, বেশি বকতে পারি না তোমার সঙ্গে—

পাঁচ টাকা কেন খরচ করবি? বাড়িতে একটাও পয়সা নেই, তার চেয়ে হেবো ডাক্তারকে—

যা বলছি তা না করলে আমি মরে যাব। যা বলি শোন, এই নাও পাঁচ টাকা—

হাত বাড়িয়ে নোট নিয়ে শৈলবালা শুধু বলল, হুঁঃ!

আর একটা কথা ছিল—কিছু না বলে বালিশে মুখ গুঁজল অতসী।

কি কি? বল না রে—

তেমনি করে অতসী খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলল, আরও একটা মানত করবে মায়ের কাছে—

কি?

ইতস্তত করে অতসী বলল, তোমার জামাই যেন ফিরে আসে!

শৈলবালা সে-ঘর থেকে গেল না। সেই পাঁচ টাকার নোট হাতে চেপে অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

১৪ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬
শুক্রবার সকাল : কলিকাতা

॥ জানোয়ার ॥

ভাদ্র মাস ভয়ের মাস। হঠাৎ জোর জল নামে। কাঁচা নালাটা ডুবে যায়। রাস্তায় জল থৈ থৈ করে। এত জল যে মোটর গাড়ির এঞ্জিন বিগড়ে যায়। একটার পর একটা। ঘন ঘন হর্ন বাজে। রিক্স, ঘোড়ার গাড়ি শব্দ করে পাশ কাটিয়ে সাবধানে বেরিয়ে যায়। আর ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

মাথায় গামছা জড়িয়ে ভিজতে ভিজতে রামদীন একবার গরু-গুলোকে দেখে যায়। ভজুয়া মোষের তদারক করে। আর বৃষ্টির ছাঁট বাঁচাতে রামশরণ ভাজা ফুলুরি-বেগুনি আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করে। ফুটো চালা ঘর। জল পড়ে চারপাশ থেকে। ফুলুরি-বেগুনি ভিজে যায়। রামশরণ নিজেও।

পিছনে লম্বা একটা বাঁশের পোল। বর্ষাকালে জল জমে বলে চলাচল করবার জন্যেই এখানকার বাসিন্দারা মিলে ওটা বানিয়েছে। কোনদিন ধসে যায় ঠিক নেই। একটু বেশি নড়বড় করছে এ বছর।

রেল লাইনের পাশে অনেকটা ঢালু জমি! লাইন বেশ উঁচুতে। মাথা তুলে তাকাতে হয় যখন সিটি বাজিয়ে ঝমঝম ট্রেন যায়। চালা ঘর কাঁপতে থাকে। কয়লার গুঁড়ো পড়ে চোখে। আর ননীবালা গজ গজ করে। অভিশাপ দেয়। কাকে কে জানে।

ঘর তুলেছে ওরা এখানে। ধাক্কা খেয়ে এখান ওখান থেকে ছিটকে আসা অনেক জাতের অনেক রকম লোক। কোথায় যাবে জানে না। কদিন থাকবে ভাবে না।

বাড়ি বাড়ি দুধ দেয়। ফুলুরি ভাজে। কাপড় কাচে। কেউ কেউ

চাকরি করতেও বার হয়। আর দু একটা ছোট ছেলেমেয়ে বই বগলে নিয়ে ইস্কুলের দিকেও রওনা দেয়।

টালিগঞ্জের ট্রামে বসে দেখা যায় সন্ধ্যেবেলা কুপি জ্বলে। গরু-মোষ উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। ফুলুরি চিবোয় মানুষ আর শোনা যায় মানুষেরই চিল চিৎকার।

গরু মোষ ছাগল মানুষে ভরা ঢালু জমি জলে ভেজে। রোদে পোড়ে। ডোবে। মাথা তোলে। রেলের সিটিতে চমকায়। মানুষ-গুলো তাকায়। গরু-মোষ ভয় পায়। তবু একসঙ্গে কাটায় দিনের পর দিন। গরু-মোষের মতোই মনে হয় মানুষগুলোকে।

টালিগঞ্জের ট্রামে বসা নির্বিকার নিজের ধান্দায় ব্যতিব্যস্ত লোক এক পলকে দেখে কি ভাবে ওদের সম্পর্কে বলা মুশকিল। দেখে কিনা আর চোখে পড়লে কিছু ভাবে কিনা অর্থাৎ প্রাণী বলে গণ্য করে কিনা তাও বলা যায় না।

ননীবালা আর যদুনাথের মতটা কিন্তু জোর করেই বলা যায়। ওরা নিজেরাই তো পাঁচজনকে শুনিয়ে মতটা জাহির করে একশ বার।

ভাগ্য সাংঘাতিক রকম পরিহাস না করলে কি আর ওদের এসে ডেরা বাঁধতে হত গরু-মোষ আর গরু-মোষের মতো মানুষ-গুলোর সঙ্গে। গরু-মোষের চেয়েও এক কাঠি নামিয়ে দেয় ওদের মাঝে মাঝে রাগের মাথায় যদুনাথ।

গানও আসে বেটাদের সারা রাত ওই আধ পেটা ছাতু আর বাসি তেলে ভাজা খেয়ে। মানুষ নাকি ওরা? জানলে ননী, আমাদের চোদ্দ জন্মের পাপের ফল—তা না হলে বুড়ো বয়সে বাস করতে আসতে হয় এই কুকুর-বেড়ালগুলোর সঙ্গে—

ননীবালা সমানে তাল মেলায় স্বামীর সঙ্গে, কুকুর-বেড়াল বলে

কুকুর-বেড়াল! রাস্তার হ্যাংলা জানোয়ার সব! মেয়ে-পুরুষ সব সমান।

তা মেয়েও আছে বটে এখানে অনেক। থাকবেই বা না কেন। মাথার ওপর চালাটা খড়ের হলেও আর ঠিক মতো দু বেলা খাওয়া না জুটলেও বাকি সব সাধ আহ্লাদ বন্ধ থাকে নাকি মানুষের। মানুষ অবশ্য এরা নয় ননীবালা আর যদুনাথের মতে। হোক না জানোয়ার। জীবন চেখে দেখবার প্রবৃত্তি কি আর জন্তু-জানোয়ারের নেই?

কিন্তু সে-কথা বোঝায় কে ওদের।

ওরাই বোঝায় দৈবদুর্বিপাকে ওদের অবস্থার চরম বিপর্যয়ের কথা। চেঁচিয়ে, গজগজ করে, এখানকার যত বাসিন্দা আছে সকলকে শুনিয়ে। ঝিকে মেরে ওদের শোনায়।

ঝি বলতে ননীবালা আর যদুনাথের মেয়ে। ওই একটি সন্তান। কার রক্ত আছে গায়ে মেয়ের। জানোয়ারের মতো জানোয়ারের দলে এভাবে বাস করলে টিকে থাকতে পারে নাকি বেশি দিন। যেন আর কেউ টিকে নেই।

থাকবে না কেন? ওরা কি মানুষ নাকি? হোক বা না হোক, মানুষ বলে তো ওদের আর ধরতে পারে না ননীবালা আর যদুনাথ—রোগা দুলালীর মা আর বাবা।

দুলালী আর বাঁচবে না। সারা দিন খকখক করে কাশে। মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে বাপ-মায়ের মুখের দিকে। রেলগাড়ির সিটি শুনে কেঁদে বলে, বাড়ি যাব—বাড়ি যাব। তোমাদের পায়ে পড়ি আমাকে বাড়ি নিয়ে চল। রেলগাড়ি থামে না কেন মাগো?

ঝম ঝম ঝম। ঘর কাঁপায় রেলগাড়ি। বুকও। আর কয়লার গুঁড়ো

পড়ে চোখে। বের করা সহজ নয়। ননীবালা গজগজ করে। যতুনাথ ছটফট করে। ছাগলটা ব্যা ব্যা করে। গরু-মোষগুলোও চুপ করে থাকে না। আওয়াজ কানে আসে বটে।

ওদের মতো মানুষগুলোর আওয়াজও। গান গায়, হল্লা করে। লখিয়ার নাম ধরে চেঁচায়। কস্তুরীকে ডাকে। আরও কত রকম নাম কানে আসে। কিন্তু কে শুনতে চায়। কুকুর-বেড়ালেরও তো কত নাম থাকে। কান জুড়োনো মধুর নাম।

বাড়ি ফিরে যেতে চায় রোগা মেয়েটা। বাড়ি থাকলে ভাবনা ছিল নাকি আর। মান বাঁচত। মেয়েটাও রোগে পড়ত না। এখানে এমন ভাবে দিন গুজরান করতে হত না ননীবালা আর যতুনাথকে। ওরা সকলেই বেঁচে যেত।

বাড়ি কোথায়। রুটির মতো উল্টেপাল্টে সেঁকা হয়েছে পূর্ববঙ্গের মানুযগুলোকে। বাড়ি গেছে, মান-সম্মান গেছে। প্রাণে বেঁচে এক বস্ত্রে পালিয়েছে তাই ঢের।

কিন্তু বেঁচে থাকা নাকি এর নাম। এমন করে থাকতে হবে জানলে সব সুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই তো হত সেদিন। সম্পত্তি ঘুষ দিয়ে জানোয়ারের খুপরিতে দম আটকে তিলে তিলে শেষ হবার কি দরকার ছিল।

কিন্তু সেকথা মেয়েটাকে বোঝায় কে। বোঝায় ননীবালা জন্ম গরিব অন্য বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের।

ভদ্রলোক না ছাই। মেয়েগুলো রাস্তার কলে জল ভরে। পান খেয়ে টেরি কেটে ছেলেগুলো কাজে বার হয়। কেউ ঘড়ির দোকান দেয়। কেউ বিজলী বাতির। কেউ নাকি সরকারী বাসে টিকিট কাটে। কথায় কথায় বলে বটে, আমরা লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক। দেশের তুর্দিন তাই অকাজ-কুকাজ করে সংসার চালাচ্ছি।

যেন তুর্দিন না হলে লাটসাহেব হয়ে বসত ওই চোয়াড়ে চেহারার

কুৎসিত লোকগুলো। যেন সব জমিদারের বেটা ছিল যত্নাথের মতো।

আর মেয়েগুলো যেন জমিদারের বেটার বউ ছিল ননীবালার মতো। কথা শুনলে গা জ্বালা করে ননীবালার। কথা সে-ও কম শোনায় নি ওদের। সে-কথার জাত যদিও একেবারে আলাদা ননীবালার মতে। মিঠে অতীতের ঝকমকে গল্প বলে ওদের কাছে জাত বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছে।

সত্যি কথাটা শোনাতে দোষ কি। ওদের বহু ভাগ্য এক জায়গায় ডেরা বাঁধতে পেরেছে ননীবালার সঙ্গে। আর ননীবালার তুর্ভাগ্য এখানে এসে তাল মিলিয়েছে একপাল জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে। সে-কথাটা ওদের সকলকে জোর করে বুঝিয়ে না দিলে চলবে কেন।

কি আর না ছিল বল না কালোর বউ! ভরি ভরি সোনা। গোয়ালে গরু। পুকুরে মাছ। বাক্স ভরা কাপড়—

জন্তর মতো ফ্যা ফ্যা করে হেসে ওঠে কালোর বউ, তাই নাকি ননী দিদি?

এত সব ছিল তোমাদের?

বলি মিছে কথা শোনাচ্ছি তোমাদের? কপাল যখন পোড়ে মানুষের তখন এমনি করেই পোড়ে!

কে একটা ফাজিল মেয়ে টিটকিরি দেয়, পোড়া কপাল আমাদের ননী দিদির!

কেষ্টর মোটা সোটা ঝগড়াটে বউটা বলে ওঠে, সোনা তো এখানেও আছে দিদি, ওই রাস্তার ওপারে পশুপতি স্যাকরার দোকানে। গরু তো এখানেই আছে রামদীনের গোয়ালে। ওই যে পুকুর—কত মাছ ওখানে। আর কাপড় আছে পাশেই বংশী ধোপার ঘরে—

চাবির গোছার ঝনাৎ শব্দ করে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে ননীবালা, পরের দেখে বুক ফেটে মর তোমরা হিংসেয়। সোনা গরু মাছ কাপড় আমাদের নিজেদের ছিল অঢেল। তাই পরের দেখে চোখ টাটায় না তোমাদের মতো—

চোখ টাটাবে কেন? চোখ জুড়িয়ে যায় দিদি—চোখ মজে যায়। তাই দুঃখ হয় তোমার দুর্দশা দেখে। গল্প বলে আর কত মন মজাবে দিদি, খিলখিল করে হেসে ওঠে মোটা সোটা ঝগড়াটে বউ।

ননীবালা আর দাঁড়ায় না। বাঁশের পোলের ওপর দুলালীর পথ আগলে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়। মেয়েটা আবার গিয়েছিল রামশরণের তেলে ভাজার দোকানে। ওর হাতে ফুলুরি দেখে সেকথা মোটেই বুঝতে দেরি হয় নি ননীবালার।

ফের কেন গিয়েছিলি ওখানে?

চোখ কচলে কাঁদে দুলালী, আমাকে ডাকে যে—

ডাকলেই যেতে হবে ছোটলোকের দোকানে? হারামজাদি মেয়ে, ওসব যা তা খাওয়া তোর না বারণ? তোর জন্যে ছাগল কিনেছি কি রাতদিন ব্যা ব্যা শোনবার জন্যে?

আমি চাই নি, আমাকে জোর করে দিল যে ফুলুরি—

ফেলে দে শিগগির, টান মেরে দুলালীর হাত থেকে বাসি ফুলুরি ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দেয় ননীবালা। জোর করে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয় মেয়েকে।

মেয়েটাও হয়েছে তেমনি। একটু জ্বর কমলেই ননীবালার চোখের আড়াল হয়। বংশী ধোপার ঘরে নানা রঙের কাপড় দেখে। রামদীনের কটা গরু হিসেব করে। ভজুয়ার মোষের বাচ্চার বয়স জানতে চায়। লখিয়ার মেয়ে নেই কেন জিজ্ঞেস করে। আর

কস্তুরীর রূপোর চুড়ি গোনে। তারপর রামশরণের দোকানে এসে বেগুনি ভাজা দেখে।

মেয়ের ভবিষ্যৎটা অন্ধকার মনে হয় ননীবালার। মরে গেলেই যেন বেঁচে যায়। বালাই ষাট! আহা, ওই একটিই তো মেয়ে। তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কম চেষ্টা করা হয় নাকি। শেষ হারটা বাঁধা দিয়ে ছাগলটা কেনা হয়েছে তো ওরই জন্যে। বলা যায় না, মেয়েটা বেঁচেও যেতে পারে ছাগলের দুধ খেয়ে। ছাগলের দুধ আর গন্ধ নাকি ও রোগে পরম উপকারী। ঘরের মধ্যেও ঘুর ঘুর করে বেড়ায় ছাগলটা। কুচকুচে কালো রঙ। ঝোলা পেট। দুধ দেয় অনেক।

মুখে কিছু না বললেও ভাবে ভঙ্গিতে দুলালীকে দূর দূর করে কালোর বউ, ফাজিল মেয়েটা আর কেষ্টর মোটা সোটা ঝগড়াটে বউ। কালো আর কেষ্টও আমল দেয় না বেশি। রোগটা নাকি সাংঘাতিক রকম ছোঁয়াচে। তাদেরও ঘরে তো ছেলেমেয়ে আছে। ও রোগ ধরলে ঠেলা সামালাবে কে। বিষ আছে মেয়েটার নিশ্বাসে। ওকে দূরে দূরে রাখাই ভাল।

মানুষগুলোর ভঙ্গি দেখে রাগে ফুলে ওঠে ননীবালার শরীর। রাস্তার কল থেকে জল ভরা বউ-এর মেয়ে নাকি দুলালী যে মিস্তিরি আর ড্রাইভার আর ছুতোরের বাড়ি গিয়ে সোহাগ কুড়িয়ে বেড়াবে। ভাববার ক্ষমতা নেই মোটা বুদ্ধি মানুষগুলোর কোন বংশের বউ ননীবালা। দুলালীর রোগ না থাকলে যেন সে ছেড়ে দিত মেয়েকে ছোট লোকের ঘরে গিয়ে মুড়ি চিড়েয় ভাগ বসাতে—নোংরা জানোয়ারের দলে মিশে নজর খারাপ করতে।

একটা গোটা ছাগল কিনে পোষবার ক্ষমতা আছে নাকি ওদের চোদ্দ পুরুষের। তার মেয়েকে দূর দূর করে—গলায় দড়ি কুকুর বেড়ালের মতো নোংরা ওই মানুষগুলোর।

গলায় দড়ি পড়ে না ওদের। ভোরবেলা টান পড়ে ঐ ছাগলটার গলার দড়িতে।

কাবুলিওয়ালাটা অনেকক্ষণ বসে থাকে বাঁশের পোলের ওপর চুপচাপ। চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে থাকে যদুনাথ আর ননীবালার ঘরের দিকে। আগেও এসেছে দু একবার। কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেছে।

প্রথম দিন সকলেই একটু থমকে গিয়েছিল কাবুলিওয়ালাটাকে দেখে। ঠিক বুঝতে পারে নি বোধ হয় কার দেখা পেতে চায় লোকটা। ভয়ে ভয়ে ছিল কালোর বউ, ফাজিল মেয়েটা আর কেষ্টর মোটা সোটা বউ। কে জানে কার স্বামী কিংবা ভাইএর কাছে এসেছে ওই গোমড়ামুখো কাবুলিওয়ালাটা।

ভয় কেটে যায় ওদের অবশ্য প্রথম দিনই। কালো বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে ওর চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল গটগট করে। কেষ্টও বার হল চটি ফট ফট করে। ফাজিল মেয়েটার ভাইও চলে গেল শিষ দিতে দিতে।

একটি কথাও বলল না কাবুলিওয়ালাটা। মুখ তুলে তাকালও না। যেমন ছিল তেমন বসে রইল।

নিশ্চিন্ত হল কালোর বউ। সত্যি কথা বলে বটে মাঝে মাঝে তার বর। কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে কখনও টাকা ধার করে না লোকটা।

ফাজিল মেয়েটাও হাঁফ ছাড়ল। যত দোষ থাক তার ভাইএর, এখনও কাবুলিওয়ালার বাড়ি অবধি দৌড়য় নি টাকা জোগাড় করতে।

কেষ্টর মোটা সোটা ঝগড়াটে বউটার মুখেও এবার হাসি ফুটে ওঠে। কাবুলিওয়ালাটা হামলা করলে তার স্বামীকে দেখে নিত সে কত বড় লম্পট মানুষটা। মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যায়

বটে আজকাল প্রত্যেক শনিবারে। টাকা পায় কোথায় জিজ্ঞেস করলে বলে বন্ধুরা খাইয়েছে। তাই কাবুলিওয়ালাটাকে দেখে বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল কেষ্টর বউএর। এবার তার দুল জোড়ায় টান পড়বে কিনা কে জানে।

কোন ভয় নেই বাকি মানুষগুলোর। রামদীন রোজকার মতো গরু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভজুয়া মোষ দেখছে। রামশরণ বেগুনি ভাজছে। বংশী ধোপা ইস্ত্রি গরম করছে। লখিয়া বালতি নিয়ে রাস্তার কলে গেছে। কস্তুরী রুটি সেঁকছে তোলা উনুনটায়।

ঘরের ফাঁক দিয়ে কাবুলিওয়ালাটাকে দেখে ঘাবড়ে যায় যদুনাথ। মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে অস্বস্তি চেপে রাখে ননীবালা। ভয়ের চেয়ে লজ্জা বেশি।

আজ উঠবে না কাঠ খোট্টা মানুষটা। লাঠি ধরে বসে থাকবে পোলের ওপর। যতক্ষণ যদুনাথকে না ধরতে পারে ততক্ষণ। শাসাবে। হামলা করবে। হাটে হাঁড়ি ভাঙার মতো ফাঁস করে দেবে ওই জানোয়ারগুলোর সামনে ওদের দৈন্য।

দিন তো চালাতে হয়ই যদুনাথকে যেমন করে হোক। কিন্তু সেকথা টের পাবে কেন গরু-মোষের মতো মানুষগুলো। ভয়ের চেয়ে লজ্জা অনেক বেশি যদুনাথ আর ননীবালার।

ভূমিকম্প হচ্ছে যেন। পোল কাঁপছে। ঘর কাঁপছে। বুক-কাঁপছে। রেলগাড়ি গেলে যেমন মনে হয় তেমন।

ব্যা ব্যা আওয়াজ করে ছাগলটা ঘুর ঘুর করে। ঘুরতে ঘুরতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে একেবারে কাবুলিওয়ালাটার সামনে। নড়ে ওঠে লোকটার বিরাট শরীর। হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে নেয় দড়ি সুদ্ধ ছাগল।

বিদ্রোহ করে ছাগলটা। জোরে জোরে ব্যা ব্যা আওয়াজ করে সাহায্য চায় বোধহয় মানুষের। কিন্তু টাকা না দিয়ে কে এসে

মুক্তি দেবে ওকে গোঁয়াড় আফগানের কঠিন কবল থেকে। লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে হিড় হিড় করে ছাগলটাকে টানতে টানতে এগিয়ে যায়। সুদ না দিয়ে থাক লুকিয়ে বেইমান বাবু। জীবটা চলুক সঙ্গে। চালাকি চলবে না রোজ রোজ।

ওগো, চোখে অন্ধকার দেখে ননীবালা, যাও, ওকে ধর। ছাগলটা নিয়ে চলে যাচ্ছে যে। দুলালী কি খাবে? ছাগলের দুধ না পেলে মরে যাবে যে মেয়েটা—

সে-কথা কি আর জানে না যদুনাথ। কিন্তু কাবুলিওয়ালাটাকে বাধা দেবে কেমন করে। বাধা দেবার মতো কোন জোরই নেই যে তার। অসহায়ের মতো বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভূতপূর্ব জমিদার নন্দন।

চিৎকার করে দুলালী কেঁদে ওঠে, ও মা, ও বাবু, ওকে মারছ না কেন? ওকে ধরছ না কেন? ডাকাত—ডাকাত! কেটে খাবে আমার ছাগলটাকে—

মেয়েটা ছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। ছাগলটাকে জাপটে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় বাঁশের পোলের ওপর। গলা ফাটিয়ে কাঁদে।

কাবুলিওয়ালাটা তাকায় না কোন দিকে। যেমন চলছিল তেমন করেই এগিয়ে যায়।

হেসে গড়িয়ে পড়ে কালোর বউ। নিজে দেখে। ফাজিল মেয়েটাকে ডেকে দেখায়। কেষ্টর মোটা সোটা ঝগড়াটে বউকে ডাকতে হয় না। রগড় দেখতে কোমর দুলিয়ে সে নিজেই এসে দাঁড়ায়। খিল খিল করে হাসে তাদের প্রতিবেশি জমিদার পরিবারের দুর্দশা দেখে। এখানে কাবুলিওয়ালার পায়ের ধুলো দেবার হেতুও এতক্ষণ পর আবিষ্কার করতে পারে সহজেই।

চোদ্দপুরুষে ছাগল কেনার ক্ষমতা নেই আমাদের—কথা কানে যায় নাকি ও কালোর বউ ?

শ্বশুড় বাড়ি যাবে ছাগলী। জমিদার বাড়ির হাল চাল না জেনে ছোট মুখে বড় কথা বল কেন দিদি ? মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি চাপে কালোর বউ।

ফাজিল মেয়েটা লাগসই কথা বলে, থাকত পাইক বরকন্দাজ দেখা যেত কটা মাথা আফগানের ঘাড়ে ! হেই কাবুলিওয়ালা, বলি প্রাণে ভয় ডর নেই তোমার—

কী হাসির ধুম ফাজিল মেয়েটার !

পাইক-বরকন্দাজ না থাকলেও পোল পেরিয়ে যাবার মুখে হঠাৎ বাধা পায় বিরাট আফগান। জন্তু-জানোয়ারের মতোই গাঁক গাঁক করতে করতে জোট বেঁধে এসে দাঁড়ায় ওর সামনে রামদীন, ভজুয়া, রামশরণ আর বংশী ধোপা।

লখিয়া আর কস্তুরী ছুটে এসে রোগা মেয়েটাকে তুলে ধরে।

কিন্তু জোট বেঁধে সামনে দাঁড়িয়ে বিক্রম দেখালে দমবে কেন কাবুলিওয়ালা। সুদ চুকিয়ে না দিলে ছাগলের দড়িই বা ছাড়বে কেন। কথাটা বাঁকা ভাষায় থেমে থেমে এদের কাছে সোজা করে তোলে সে।

কথাটা মিথ্যে নয়। মানতে হবে বৈকি। অন্যায় গায়ের জোর তো আর দেখানো যায় না কাবুলিওয়ালাকে। নিজেদের মধ্যে ওরা কি বলাবলি করে। ভদ্রলোক। বড় লোক। আজ না হয় দৈবদুর্বিপাকে এসে পড়েছে ওদের মধ্যে। ওরা থাকতে ছাগলের দুধ খেতে না পেয়ে মরে যাবে নাকি রোগা মেয়েটা। কাবুলিওয়ালা ছাগলটা টাকার বদলে টেনে নিয়ে গেলে তাই তো ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে ?

ওরা জানতে চায় সুদের পরিমাণ। মনে মনে কি হিসেব করে।

তারপর সকলে মিলে কিছু কিছু দিয়ে বেয়াড়া কাবুলিওয়ালার হাতে একসঙ্গে গুঁজে দেয় সবসুদ্ধ উনিশ টাকা বারো আনা।

তখন চোখের জল মুছে ছাগলের দড়ি ধরে হাসতে হাসতে বাপ-মায়ের কাছে আবার ফিরে আসে দুলালী।

মুক্তির উল্লাসে গলার জোর তিনগুণ বেড়ে যায় ছাগলটার। ব্যা ব্যা করে মাটি ফাটায়।

ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় কালোর আর কেষ্টর বউএর। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বিজলী বাতির মিস্ত্রি ভোলার ফাজিল বোনটা। গুম হয়ে যায়। সরে পড়ে একে একে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোরের মতো উঁকি মেরে সবই দেখতে পায় ননীবালা আর যদুনাথ। সবই শুনতে পায়। বুঝতে পারে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গরু-মোষের মতো ছোটলোকগুলোর দিকে।

জন্তু-জানোয়ারের মতো ওদের আর মনে হয় না বটে এখন। মানুষের মতোও নয়। তার চেয়ে অনেক ওপরে এমন কোন প্রাণী—

কিন্তু চট করে ননীবালা আর যদুনাথ ভাবতে পারে না ওদের জন্যে অন্য কোন নাম।

৩০শে অগস্ট : ১৯৫৭
শুক্রবার সকাল : কলিকাতা

॥ উত্তম মধ্যম ॥

জাস্টিস ঘোষের ছোট মেয়ে রাধা হঠাৎ একদিন বিয়ে করে বসল প্রশান্তকে।

নিতান্ত সাধারণ ছেলে। ছাত্রজীবনে রাধার সঙ্গে পড়বার সময় নাকি অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু চাকুরি জীবনে কোন বিশেষ পরিচয় দিতে পারল না।

আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মতোই সাধারণ চাকরি প্রশান্তর। তার মধ্যে কি প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেল রাধা, বিচক্ষণ বিচারপতি অনেক মাথা ঘামিয়েও তা বুঝতে পারলেন না।

কৃতিত্বের সব ভাগটাই অবশ্য প্রশান্তর প্রাপ্য। ঘরে বাইরে কেমন একটা গোটা পৃথিবী জয় করে নেওয়ার ভাব। আছে বৈকি কোন গোপন প্রতিভা এই মানুষটার। তা না থাকলে অত বড় জজের মেয়ে ভুলবে কেন।

প্রশান্ত নিজে কিন্তু অবাক হয়নি, নিজের কাছে নিজের মূল্য শুধু অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন বিয়ে করা সহজ নয়। যে সে লোকের কাজ নয়। তার কিছু বিশেষত্ব আছে বলেই রাধা তাকে বিয়ে করেছে। এই কথাটাই সকলকে বলে প্রশান্ত। রাধাকেও।

প্রথম দিনই সঙ্কোচ হয়েছিল প্রশান্তর। ছোট ছোট দুটো ঘর। সরু গলি না হলেও এমন কিছু চওড়া রাস্তা নয় দৈন্যের। ছাপ চার পাশে। লজ্জার কথা তো বটেই। কথার পর কথা সাজিয়ে প্রশান্ত দৈন্যের ওপর ঝকমকে আবরণ চাপাবার চেষ্টা করল।

কি যে হয়েছে আজকাল কলকাতা শহরে, বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রশান্তর মুখে, বাড়ি পাওয়া যায় না কোথাও। কত চেষ্টা করলাম এই এক মাস ধরে—

রাধা হেসে বলল, কার জন্যে বাড়ির দরকার ?

আবার কার জন্যে ? আমাদের জন্যে। এ বাড়িতে থাকতে পারে নাকি ভদ্রলোক !

কেন পারবে না ? তুমি তো বহুদিন ধরে আছ—

বাধা দিয়ে প্রশান্ত বলল, দায়ে পড়ে আছি। আশ্চর্য, কেউ একটা বাড়ির সন্ধান দিতে পারছে না।

একেবারে প্রথম দিনই বাড়ি নিয়ে একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি করে প্রশান্ত। রাধা বোধ হয় সহজে ধরতে পারে না কেন সে আসতে না আসতেই প্রশান্ত এত ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তা ছাড়া ভাড়া বাড়িয়ে হঠাৎ এখন নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়া তার মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রশান্তর কথায় সে কোন বুদ্ধির পরিচয় পায় না। ভাবে, পড়াশুনোয় বেশিরকম ভাল হলে বোধহয় মানুষের সাংসারিক বুদ্ধিটা এমনি মোটা হয়ে যায়।

কয়েকদিন পর একটু দেরি করে বাড়ি ফিরল প্রশান্ত। হাসি হাসি মুখ। যেন এক মস্ত দুর্ভাবনা ঘুচে গেছে। বাড়িতে ঢুকেই রাধাকে খবর দিল সে।

বাঁচা গেল। একটা বাড়ি পেয়েছি। আগাম টাকা দিয়ে সব ঠিক করে এলাম আজ। আর কয়েকদিন পরেই উঠে যাব নতুন বাড়িতে।

কথা শুনে খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না রাধা। এখানে থাকতে তার একটুও অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। শুধু শুধু ছুটোছুটি করছে প্রশান্ত।

ভাড়াটা একটু বেশিই, আবার বলল প্রশান্ত, কি আর করব ?

তার কম ভাড়ায় মোটামুটি সাধারণ রকম বাড়িও কিছুতেই পাওয়া যায় না।

কত ভাড়া? আস্তে জিজ্ঞেস করল রাধা।

এমন কিছু বেশি নয় অবশ্য, টাই খুলতে খুলতে প্রশান্ত বলল, দু শ পঁচিশ টাকা।

চমকে ওঠে রাধা। কেমন থতমত খেয়ে যায়। যে লোক পুরো সাড়ে চারশ টাকাও মাইনে পায় না মাসে, সে কোন বুদ্ধিতে অত টাকা ভাড়া দিয়ে বাড়ি নিতে চায়।

কথা না বলে আর পারে না রাধা, অত টাকা বাড়ি ভাড়া দিলে সংসারের আর সব খরচ কুলোবে কেমন করে?

রাধা খুব সাধারণভাবে কথাটা বললেও খোঁচা লাগে প্রশান্তর, খুব চালাতে পারব। এ মাস থেকে অনেক মাইনে বেড়েছে আমার—তা ছাড়া সন্ধ্যেবেলা এক মাড়োয়ারি ছাত্র পড়াব।

কি দরকার শুধু শুধু পরিশ্রম করবার? এখানে তো বেশ আছি। দুজন লোকের জন্যে মিছিমিছি বেশি ভাড়া দিয়ে লাভ কি?

কি যে লাভ প্রশান্ত ঠিক ঠিক সাজিয়ে বলতে পারে না। কিছু বলতে গেলে অবশ্য লোকসানের অঙ্কটাই বড় হয়ে উঠবে। লোকসান হলেও আর একদিক দিয়ে লাভ হবে বৈকি প্রশান্তর। কিন্তু সে-কথাটা বলা যায় না রাধাকে।

কেন বলা যায় না, তারও আবার একটা কারণ আছে। সেই কারণের জন্যে লোকসানটাও লাভ হয়ে দাঁড়ায় প্রশান্তর মনগড়া দম্ভের দাঁড়িপাল্লায়।

রাধার মতো মেয়েকে বিয়ে করতে পারাটা তার পক্ষে মস্ত লাভ। আবার শ্বশুর বাড়িতে কল্কে না পাওয়াটা সাংঘাতিক রকম লোকসান। আর এখানে ওখানে আপিসে আড্ডায় জজের মেয়েকে বিয়ে করতে পারার প্রতিভার যাচাইটাও অস্বস্তিকর। যেন প্রশান্ত

কেউ নয়, কিছু নয়। সদাগরী আপিসের একটা সামান্য চাকুরে। খুব সামান্য না হলেও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের তুলনায় সামান্য তো বটেই।

বিয়ের পর হঠাৎ তাই প্রশান্ত রাতারাতি নিজের সম্পর্কে অতি-মাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে। মন চিরে হাতড়ায় কেষ্ট-বিষ্টু গোছের আত্মীয়দের। বাপ-ঠাকুর্দার গুণাগুণ ভেবে মরে।

কী মেধা নিয়ে জন্মে আদর্শের জন্যে ইচ্ছে করে ভুগছে সেকথা শোনাতে ইতস্তত করে না পাঁচজনকে।

কেউ শোনে কি না শোনে, বিশ্বাস করে কি না করে কে জানে। বোধ হয় শোনে না। বোধ হয় বিশ্বাস করে না।

কৌশল করে বৃথাই এত বাগাড়ম্বর করে প্রশান্ত। কারণ ব্যাপারটা শেষ অবধি থেকে যায় সেই একই। অর্থাৎ প্রশান্তর মতো একটা সাধারণ ছেলেকে জাস্টিস ঘোষের মেয়ে কি দেখে বিয়ে করল—পাঁচজন এত শুনেও বলাবলি করে সেই পুরনো কথা।

মনে মনে ক্ষেপে যায় প্রশান্ত। রাধার ওপরও। কিন্তু কথা জোগায় না মুখে। তাই লোকসান দিয়ে লাভ দেখাতে চায় রাধাকেই।

আর জাস্টিস ঘোষের চেয়ে তার প্রতিভা যে কিছু বেশি সেকথাটাও রাধাকে আজকাল নানা ভাবে বোঝাতে দ্বিধা করে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলেই রাধার বাবার সঙ্গে তার নিজের তুলনা করবার চমৎকার সহজ সূত্র খুঁজে পায় প্রশান্ত।

আর তখনই আঘাত পায় রাধা। প্রশান্তর এই নিজেকে জাহির করবার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। ভাবে, এসব কথা ওঠে কেন। প্রশান্তকে বড় বলে মেনে নিতে পেরেছে বলেই

তো বাপের বাড়ি এক কথায় ছেড়ে সে তার হাত ধরেছে। এখন ও বাড়ির বাকি মানুষগুলোকেও আপন মনে গজ গজ করে নিজেকে বড় ভাবাবার দরকারটা কি। সম্পর্কটা তার শুধু রাধার সঙ্গেই তো। কাজেই ও বাড়ির অন্যান্য মানুষগুলিকে নিয়ে মাথা ঘামানো প্রলাপেরই সামিল।

শেষ অবধি কিন্তু বাড়িটা বদল করে ছাড়ল প্রশান্ত।

উঠে এল সেই আগাম ভাড়া দেওয়া দু শ পঁচিশ টাকার বড় বাড়িটাতেই। উঠে আসার কারণ একমাত্র প্রশান্তই জানল বোধ হয়। রাধা জানতে পারলে আবার আঘাত পেত। তার বাবার সঙ্গে প্রশান্ত নিজেকে তুলনা করলে যেমন পায় তেমন।

কিন্তু মাড়োয়ারি ছাত্র আর কতদিন টিকে থাকে।

ওদিকে ব্যবসার বাজার মন্দা হয়ে আসছে দিন দিন। ছাত্রের বাপ ছাত্রকে ফাটকা বাজার সম্পর্কে হাতে খড়ি দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পড়াশুনো মাথায় থাক, এই বেলা ব্যবসা জাঁকিয়ে নিতে না পারলে টেক্কা দিতে শিখবে কেমন করে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে। আসল কথা হল, এক কথায় মাস্টারি করা ঘুচে গেল প্রশান্তর। এখন দু শ পঁচিশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিলে টান পড়বে বৈকি সংসারে।

পড়ে পড়ুক। রাধাকে কিছু বলা হবে না এখন। সে একথা জানলে মান যাবে প্রশান্তর। দেখা যাক সে টের পাবার আগে আর একটা ছাত্র জুটিয়ে নিতে পারে কি না প্রশান্ত।

না পারলে আপিসের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা নিয়ে চালিয়ে দেয়া যাবে কয়েক মাস। তবু রাধাকে কিছু জানতে দেওয়া হবে না। সত্য গোপন করবার প্রবৃত্তি জাগে প্রশান্তর দম্ভের তাগিদে। আর দম্ভ থাকলে ফাটল তো একটু ধরবেই প্রেমে।

অবশ্য দোষ কারুরই নয়। অবিশ্বাস, ব্যাভিচার, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খুন জখম—এসব কথা ওঠেই না এদের ব্যাপারে। তবু মন জ্বলে দুজনের। বিনা দোষেই।

মাঝে মাঝে প্রশান্তর রসিকতার অর্থ বোঝা দুঃসাধ্য হয় রাধার পক্ষে। বাইরের কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতে হঠাৎ রাধার বাপের বাড়ির পরিচয়টা জানিয়ে দেয় প্রশান্ত।

হালকা সুরেই কথা বলে অবশ্য। কিন্তু কথাগুলো যেন অতি নাটকের নটের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অতিরিক্ত অনাবশ্যক মনে হয় রাধার। তবু বলে প্রশান্ত। কেন বলে তার কারণ খুঁজে পায় না রাধা। অনেক চেষ্টা করেও না।

একদিন ও স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিল প্রশান্তকে। কৌতূহল ছিল না রাধার কথায়, বিস্ময়ও ছিল না চোখে। আপোষের একটা সুর কেঁপেছিল গলার স্বরে।

কাঁপলে হবে কি, দাম্ভিক মানুষ হার স্বীকার করে নাকি সহজে? মাথা নিচু করবার আভাস পেলেই সত্যি কথা না বলে মিথ্যা কথা বলে চট করে। এ তো জানা কথাই।

তবু রাধা বুঝতে পারে নি। প্রশান্তর গলদটাই যে ধরতে পারে নি এখনও। তা পারলে তো কথাই ছিল না। আপোষের একটা পথ হয় তো তাহলে খুঁজে বের করতে পারত রাধা।

অফিসের সেক্রেটারিকে একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করল প্রশান্ত। বিয়ের আগে আসতে বলতে সাহস পায় নি। আর বললেও সে নেমন্তন্ন গ্রহণ করত কিনা সন্দেহ।

ভদ্রলোক বাঙালী। বয়সটাও খুব বেশি নয়। প্রশান্তর চেয়ে বছর দশেকের বড় হবে হয় তো। যদিও অনেক গম্ভীর দেখায় বয়সের তুলনায়। নাম অমিয়কান্তি তালুকদার।

ইচ্ছে করেই তাকে নেমন্তন্ন করেছিল প্রশান্ত। সে জানত

এবার খুশি হয়েই তার বাড়িতে আসবে তালুকদার। কারণ বিয়ের পর হয় তো তার মনের খাতায় প্রশান্তর নাম অনেক ওপরে তুলে আনা হয়েছে।

যদি সে বাড়িতে আসে আর রাধার তার সঙ্গে আলাপ হয় তাহলে বলাই বাহুল্য খুশি সে হবেই এবং প্রশান্তর খাতিরে না হোক রাধার খাতিরে একটা উপকার করবার লোভ সে সামলাতে পারবে না।

তখন মাইনে কিছু বাড়বে প্রশান্তর। তার চিন্তা যে একেবারে ঠিক পথ ধরে চলে সে-প্রমাণ পাওয়া গেল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই।

উন্নতি অফিসে হল প্রশান্তর। আশাতিরিক্ত উন্নতিই বলা চলে। হয় তো সামান্য একটু কষ্ট করলে ছাত্র না পড়িয়েও এখন দু শ পঁচিশ টাকা বাড়ি ভাড়া দেওয়া যায়।

কিন্তু রাধার সঙ্গে প্রশান্তর সম্পর্কটা বাইরে ভেতরে কেমন একটু অন্য রকম হয়ে যেতে লাগল যেন। প্রশান্তর অফিসের সেক্রেটারি ওই তালুকদারের ব্যাপারেই।

প্রেম, ঘর ভাঙা কিংবা আত্মহত্যার অবশ্য কোন সম্ভাবনা নেই। ওসব ব্যাপারই নয়। তালুকদারের সঙ্গে রাধার আলাপ করিয়ে দেবার সময় প্রশান্ত কৌশলে শ্বশুর বাড়ির কথা তুলেছিল। যদিও সব কথা জানে তালুকদার, নতুন করে তাকে জানাবার কোন দরকার নেই তবু আর একবার রাধার সামনেই তাকে জানিয়েছিল প্রশান্ত।

প্রশান্তর কথা শুনে রাধা ঘাবড়ে যায়। এখনও এমন করে প্রত্যেকের কাছে তার বাপের বাড়ির কথা কেন তোলে প্রশান্ত। ও বাড়ির লোক যখন স্বীকার করে না তাকে। প্রশান্ত নিজেও যে স্বীকার করে তা নয় কিন্তু লোকের কাছে ও বাড়ির কথা তোলবার সময় গর্বে তার চোখ দুটো যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রশান্ত মনের মতো কৈফিয়ৎ দিতে না পারলেও রাধা ব্যাপারটা একটু একটু বুঝতে পারে। পড়াশুনোয় প্রশান্তর মতো অত ভাল না হলেও রাধা এমন কিছু খারাপ ছাত্রী ছিল না। প্রথমটায় প্রেমে অন্ধ হয়ে গেলেও আস্তে আস্তে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় সে।

সে জিজ্ঞেস করল প্রশান্তকে, তোমার স্ত্রী শুধু এই পরিচয় দিলেই তো হত-- সকলের কাছে তুমি আমার বাবার নাম কর কেন ?

তোমার বাবার নাম ? যেন নামটাই জানা নেই প্রশান্তর এমন ভান করল সে, তোমার বাবার নাম করব কেন ?

রাধা স্পষ্ট বলল, আমি কার মেয়ে সেকথা মিস্টার তালুকদারের কাছে বলবার কি দরকার ছিল ? উনি তো জানতে চান নি কিছু ?

বলেছিলাম নাকি ? কি ভাববার চেষ্টা করল প্রশান্ত, ওহো, ওর সঙ্গে তোমার বাবার খুব আলাপ আছে কি না সেই জন্মেই বলেছিলাম কথাটা।

রাধা বলল, আর কেউ জিজ্ঞেস না করলে আগে থেকে কিছু বল না —

রাধার কথা শুনে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল প্রশান্ত, কেন ? এ বাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির তফাৎ বড়ই বেশি মনে হয় বুঝি ?

অবাক হল রাধা। আবার আঘাত পেল প্রশান্তর কথায়। আহত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তফাতের কথা মনে হয় না, ও বাড়ির কথা আমি যখন মনে রাখতে চাই না, তখন তুমিই বা বারবার সেকথা লোককে জানাবে কেন ?

অভদ্রের মতো প্রশান্ত গলার স্বর তুলে বলল, আমার মনে রাখবার মতো অনেক জিনিস আছে পৃথিবীতে। আর ওকথা লোককে জানিয়ে কি চারটে হাত বেরুবে আমার ?

কি বেরুবে না বেরুবে তুমিই জান। কিন্তু আমি বার বার

লক্ষ করেছি কোন দরকার না হলেও হঠাৎ লোককে তুমি না জানিয়ে পার না আমি কার মেয়ে। শুধু শুধু এটা করতে যাও কেন ?

শালীনতা জ্ঞান থাকে না প্রশান্তর, আমার বন্ধুরা যখন তোমাকে দেখতে আসে তখন তাদের জানান দরকার বৈকি যে আমি একটা রাস্তার মেয়ে ধরে আনি নি। তোমার বাপ-মা আছে, সেকথা ওদের বলা কি খুব অন্যায় ?

মোটেই নয়, প্রশান্তর কাছ থেকে আঘাত খেয়ে রাধার গলার স্বরও কঠিন হয়ে ওঠে, কিন্তু তুমি কাউকে সেকথা বলতে বাকি রেখেছ বলে আমার মনে হয় না। যাহোক ভবিষ্যতে আমার সামনে কারুর কাছে বাবাকে নিয়ে গর্ব কর না। কারণ ওঁরা তোমাকে তেমন দৃষ্টিতে দেখেন না বলে আমিও চাই তুমিও ওঁদের পরিচয় কোথাও দেবে না—

পরিচয় দেবার জন্যে তো আমার ঘুম হচ্ছে না, আপন মনে বিড় বিড় করে প্রশান্ত, পরিচয় দিয়ে কি গৌরব বাড়বে আমার ? অমন জজ কি পৃথিবীতে একটাই আছে নাকি ? কত আছে কলকাতা শহরে কে তার খবর রাখে—

এসব অবান্তর কথা রাধা শুনতে চায় না প্রশান্তর মুখ থেকে। সে কেন বলে তাও বুঝতে পারে না। তবু বলে যায় প্রশান্ত। না বললে মান থাকে না বোধ হয় !

কোন খবর না দিয়ে অমিয়কান্তি তালুকদার এল প্রশান্তর বাড়িতে হঠাৎ আর একদিন। রাধার সঙ্গে কথা বলে ভাল লেগেছে সেদিন তাই হয়তো দুটো কথা বলবার জন্যে এসেছে আবার।

তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে প্রশান্ত যেন গলে গেল, আসুন স্যার, কি সৌভাগ্য ! বসুন রাধাকে খবর দিই—

উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশান্ত রাধার সন্ধানে ছুটে যায়। সে কেমন করে বুঝে নেয় রাধার জন্যেই এসেছে তালুকদার। প্রশান্ত একা বাস করলে কিংবা কোন সাধারণ লোকের সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করলে হয় তো এ রাস্তা দিয়েই হাঁটত না অমিয়কান্তি তালুকদার।

তবু যখন না ডাকতেই এসেছে তখন যতটা পারা যায় কাজ গুছিয়ে নিলে ক্ষতি কি। ঝোঁকের মাথায় কথাটা রাধাকেও বলে ফেলে প্রশান্ত।

রাধা ঠিক ধরতে পারে না সে কি বলতে চায়। তবু হেসে কথা বলে তালুকদারের সঙ্গে। প্রশান্তর উন্নতি হবে জেনে একটু বেশি কথাই বলে বোধ হয়।

উন্নতি হওয়া না হওয়া পরের কথা।

কিন্তু তালুকদার বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যায় প্রশান্ত। ক্ষেপে ওঠে। চিৎকার করে।

অত আবোল-তাবোল কথা বলবার কি দরকার ছিল তালুকদারের সঙ্গে? এখন যদি রোজ রোজ আসতে আরম্ভ করে তাহলে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে কে বলতে পারে। রাধার বাবার সমাজের চেয়ে প্রশান্তর সমাজটা একটু অন্যরকম তাই এই সমাজের নিয়মকানুন বুঝে যদি রাধা চলা ফেরা না করে তাহলে মান থাকে না প্রশান্তর। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে রাধার জন্যে বিদ্রূপ সহ্য করতে পারবে না সে।

অবাক হয়ে রাধা বলল, তুমিই তো বলে দিলে মিস্টার তালুক-দারের সঙ্গে একটু বেশি আলাপ করতে—তাহলে অফিসে সুবিধা হবে তোমার—

বাধা দিয়ে গর্জন করে উঠল প্রশান্ত, তা বলে লোকটার গায়ে একেবারে ঢলে পড়তে হবে নাকি?

অভদ্রের মতো কথা বল না, উত্তেজনায় রাধার শরীর কাঁপতে থাকে।

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে প্রশান্ত বলে, ভদ্রতা কি আমাকে জজ সাহেবের বাড়িতে গিয়ে শিখে আসতে হবে নাকি ?

নিজেকে সামলাতে পারে না রাধা। তার মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে যায়, জজ সাহেবের বাড়ির লোক ভদ্রতা শেখাবেন না তোমাকে। যদি শেখাতেন তাহলে তুমি কৃতার্থ হয়ে যেতে—

তাই নাকি ? স্থান কাল জ্ঞান থাকে না প্রশান্তর, বিদ্যা-বুদ্ধি যাচাই করলে কে কাকে শেখাতে পারে সে-খবর রাখ না তুমি ?

আমি রাখলেও আর কেউ গ্রাহ্য করে না তোমার গুণাবলী—তোমার মিষ্টার তালুকদারও নয়।

তোমাকে কানে কানে সেকথা বলে গেছে নাকি লোকটা ?

কেউ বলে নি। ভাবে-ভঙ্গিতে তুমিই অনেকবার আমাকে সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছ।

বুক জ্বলে প্রশান্তর। রাধাকে আক্রমণ করতে ইচ্ছে করছে শানিত কথার প্রয়োগে। কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

এমনি করেই আরম্ভ হল।

রাধাও অল্পে অল্পে বুঝতে লাগল সব। দোষটা যেন সম্পূর্ণ তার একার। সে যেন মহা অন্যায় করেছে প্রশান্তকে বিয়ে করে। আর প্রশান্ত ধন্য করেছে তাকে। আজকাল প্রায়ই সে-কথাটা জোর করে প্রশান্ত বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে রাধাকে।

কেন সে সব জিনিসটা তেতো করে দেবার চেষ্টা করে রাধা বুঝতে পারে না। এমন হবে জানলে মা-বাবাকে অবাক করে প্রশান্তর সঙ্গে ঘর করতে আসত না রাধা।

কোথাও কিছু নেই তবু চাপা আগুনের আঁচ ধিক ধিক করে দু জনেরই মন। প্রশান্ত মাঝে মাঝে ছোট তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ্য করে ইন্ধন জোগাতে ইতস্তত করে না সেই মন-জ্বালানো আগুনে।

বিয়ের আগে রাধা ভেবেছিল তার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবে প্রশান্ত। ছোট ঘরে বাস করলেও বড় মনের আলোয় উজ্জ্বল করে রাখবে চারপাশ অসীম সমবেদনায়। কোন দুঃখ থাকবে না রাধার। মা-বাবার কথা ভেবে কোন অনুতাপ জাগবে না মনে।

কিন্তু প্রথম থেকেই বড় ঘরের সন্ধানে মাথা খুঁড়তে লাগল প্রশান্ত। বড় বাড়িতে উঠেও এল সে। কিন্তু আলো জ্বালাতে পারল না রাধার মনের মতন করে।

ছোট ঘরে আলো চেয়েছিল রাধা। তাই বড় ঘরের অন্ধকার ছেড়ে ছোট ঘরে স্বেচ্ছায় চলে এসেছিল সব তুচ্ছ করে আলোর সন্ধানে।

কেন এত বড় ভুল হল রাধার হিসেবে!

অভাবে নাকি মেজাজ খারাপ হয় মানুষের। রাধা ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করে অন্য ভাবে। বিয়ে করে খরচ বেড়েছে প্রশান্তর। রাধাকে সুখী করবার জন্যেই বড় বাড়িতে উঠে এসেছে সে। ছাত্র পড়িয়ে পরিশ্রমও করছে বেশি হয় তো রাধার স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ করেই। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে খরচ জোগাতে। তাই মাথার ঠিক নেই প্রশান্তর।

এমনি চিন্তা করতে করতে প্রশান্তর পরিশ্রম কিছুটা লাঘব করবার জন্যে বেশ সহজভাবে বলল রাধা, সারাদিন তো বাড়ি বসে থাকি একা একা ভূতের মতো, তাই ভাবছি একটা চাকরির চেষ্টা করি দুপুর বেলা? তুমি একা আর কত পরিশ্রম করবে?

অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে প্রশান্ত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাধার দিকে। এসব কথা কেমন করে ভাবতে পারে সে। জাস্টিস ঘোষের মেয়ে বিয়ের পর চাকরি করতে শুরু করেছে শুনলে প্রশান্তর সম্বন্ধে ধারণাটা খুব উঁচু হয়ে উঠবে না নিশ্চয়ই হিংসুক মানুষের। আর রাধা তো জানতই সে আর এক জজের ঘর করতে যাচ্ছে না। কাজেই এখন প্রশান্তকে লোকের কাছে ইচ্ছে করে ছোট করবার মানে কি!

মেয়েরা চাকরি করে নাকি তোমাদের সমাজে? কাটা কাটা কঠিন গলার স্বর প্রশান্তর।

দরকার পড়লে করে বৈকি।

এখন দরকার আছে নাকি কোন? রাধার উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রশান্ত বলে, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি এমন ভাবে থাকতে?

আমার কথা ভাবছি না। তুমি বেশি পরিশ্রম করে খরচের কথা ভেবে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছ তাই বলছি—

বেশ আস্তেই কথা বলল প্রশান্ত, আমাকে খরচের কথা ভাবতে হয়। আমাকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। আমি যে হাইকোর্টের জজ নই সেকথা তো বহুদিন আগে থেকেই তুমি জানতে—

হ্যাঁ জানতাম, বাধা দিয়ে এক ঝাপ্টায় রাধাও ঝেড়ে ফেলে সৌজন্যের সব আবরণ, কিন্তু তুমি যে এত ছোট আর তোমার মন যে জাত-কেরানীর চেয়েও অনেক বেশি নোংরা তা জানতাম না— অদ্ভুত বিবর্ণ দেখায় রাধার মুখ, যদি জানতে পারতাম তাহলে সব ছেড়ে আসতাম না তোমার কাদা ভরা মনের পরিচয় পাবার জন্যে।

রাধার মেজাজ দেখে সামান্য বিচলিত হয়ে প্রশান্ত বলে, আবার ফিরে গেলেই তো পার—

আর ফিরে যাওয়া যে যায় না সেকথা তো ভাল করেই জান। চাকরি করতে দিতে তোমার যখন এত আপত্তি তখন ফিরে গেলে যে আরও কত ধাপ নেমে যাবে বন্ধুবান্ধবের কাছে সেকথা বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার যে নেই তা তো নয়।

তাহলে, থেমে থেমে বলে প্রশান্ত, আমার জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করছ তুমি বল ?

তা জানি না। তবে ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলছি। ওপরেও উঠতে পারব না, নিচেও নামতে পারব না। মাথার ওপর ছাদ নেই, পায়ের তলায় মাটিও নেই। এমনি করেই কাটাতে হবে সারা জীবন সেকথা ভেবেই কষ্ট পাচ্ছি।

প্রশান্তর সামনে চোখের জল ফেলবে না বলে অন্য ঘরে এসে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চোখ মোছে রাধা।

বাড়ির পিছনে একটু দূরে একটা বস্তি। সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে অনেকক্ষণ।

শান্তি আছে ওখানে। সম্পদ আছে তার বাপের বাড়িতে। তার ঘরেই শুধু কিছু নেই।

৯ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৭

সোমবার সকাল : কলিকাতা

॥ দম্ভ ॥

সেই প্রথম বার স্বামীর সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করল প্রতিমা। আর একটু পরেই অমূল্য অফিসে বেরিয়ে যাবে, শার্ট গায়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুল ঠিক করছিল, হঠাৎ পাশে এসে দাঁড়াল প্রতিমা।

অমূল্য অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল। এ সময় কখনও সে তার কাছে আসে না। অমূল্য নিজেই আলনা থেকে দরকার মতো জামা কাপড় টেনে নেয়, চাকরকে ডেকে পান দিতে বলে। তারপর যথাসময় অফিসে বেরিয়ে যায়। প্রতিমা তখন কোথায় থাকে সে জানে না। হয়তো পাশের ঘরে সংসারের কাজ করে কিম্বা রান্নাঘরে থাকে।

প্রতিমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার আরও কাছে এসে অমূল্য জিজ্ঞেস করল, কি ?

প্রতিমা মাথা তুলে স্বামীর দিকে তাকাল। কি যেন সে বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল প্রতিমা।

অমূল্য আবার জিজ্ঞেস করল, কিছু বলবে ?

হ্যাঁ।

বল না ?

তবুও ইতস্তত করে প্রতিমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, উনি কেন আসেন ?

কে ? কিছু না বুঝে প্রশ্ন করল অমূল্য।

ওই যিনি আজ সকালে এসেছিলেন!

তুমি এলার কথা বলছ ?

হ্যাঁ, কেন আসেন উনি ?

প্রতিমার প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ অমূল্য দিতে পারল না। দু এক মিনিট সে কি ভাবল।

তারপর থেমে থেমে বলল, অনেক দিন থেকে আলাপ কিনা, এলার স্বামী আমার খুব বন্ধু—

বাধা দিয়ে প্রতিমা বলল, স্বামীর সঙ্গে তো উনি থাকেন না শুনি ?

তা তো জানি না।

আর উনি তো সব সময় একাই আসেন, ওঁর স্বামীকে তো কখনও আসতে দেখি না—

অমূল্য বলল, বোধহয় সময় পায় না। কিন্তু এত কথা তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ প্রতিমা ?

স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রতিমা পাশের ঘরে চলে গেল। আর স্ত্রীর এমন অস্বাভাবিক কৌতূহল দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে অমূল্য অফিসে বেরিয়ে গেল।

যার সম্পর্কে প্রতিমার গর্ব করবার কিছু নেই তার ওপর এমন কৌতূহল অস্বাভাবিক বৈকি। খুব বেশি দিন বিয়ে হয় নি তাদের। সংসারে শান্তি আছে কিন্তু আনন্দ নেই। কেন নেই, সেকথা ওরা দুজনেই জানে। একজন অতি সাধারণ মানুষ আর একজন অসাধারণ সুন্দরী।

তবু কেউ কলহের সূত্র ধরে কোন দাবী জানায় না। অমূল্যর মার্জিত মন বলে সে তর্ক করে না আর উপায় নেই বলে প্রতিমা সংসারের কাজে বেশি করে মন দেয়। এক বাড়িতে বাস করেও দুজনে নিঃশব্দে দিনে দিনে যেন দূরে সরে যায়।

খুব সকালে এলা এসেছিল।

কেন এসেছিল? অমূল্যর মতো লোকের সঙ্গে কি দরকার তার? প্রতিমা কল্পনা করতে পারে নি, এলার মতো নাম করা চিত্রতারকা এমন করে তাদের বাড়িতে আসবে, সহজ সুরে একান্ত আপনার লোকের মতো অমূল্যর সঙ্গে কথা বলবে।

কিন্তু আড়ালে ডেকে নিয়ে কি বলল তার স্বামীকে এলা? তবু অমূল্যকে কোন প্রশ্ন করতে পারল না সে।

সকাল সাতটা বেজেছে তখন। অমূল্য খবরের কাগজ পড়ছে। চাকরকে দিয়ে প্রতিমা চায়ের কাপ পাঠিয়ে দিয়েছে। এমন সময় মোটরের হর্ন বাজল। তারপর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

অমূল্যর কণ্ঠস্বর শুনল প্রতিমা, এ কি আপনি? আসুন আসুন—

দূর থেকে প্রতিমা বুঝতে পারল, যে এল তাকে দেখে বেশ বিচলিত হয়েছে তার স্বামী। আর একটু পরেই মেয়ের গলা শুনে অবাক হয়ে গেল সে। কে এমন করে এসে তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছে?

না এসে কি করি বলুন? বিয়ের পর আপনার তো আর দেখাই পাওয়া যায় না—

ব্যস্ত হয়ে অমূল্য বলল, আমি শিগগিরই যেতাম আপনার কাছে। এই নানা কাজে—

কই বউ কোথায়? দেখে যাই কাকে নিয়ে এত ব্যস্ত আছেন আপনি।

ততক্ষণে প্রতিমা এসে সে-ঘরে দাঁড়িয়েছে।

তাই গলার স্বর চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না প্রতিমা। এলার মতো চিত্রতারকা এমন সহজ সুরে তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছে।

এই যে, প্রতিমাকে দেখে অমূল্য বলল, এঁকে তো নিশ্চয়ই চেন। আর এর নাম প্রতিমা। আশা করি বুঝতে পেরেছেন এ কে।

তা আর বুঝতে পারি নি, প্রতিমার কাছে সরে এসে এলা বলল, বাঃ, চমৎকার বউ হয়েছে আপনার! একটু থেমে ও আবার বলল, তাই বলি, কেন দেখা পাওয়া যায় না আপনার আজকাল—

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে প্রতিমা বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। আমি চা নিয়ে আসি।

না না, বাধা দিয়ে এলা বলল, আজ বসতে পারব না। আমার স্যুটিং আছে এখুনি, এদিক ওদিক তাকিয়ে ইতস্তত করে অমূল্যকে সে বলল, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—

প্রতিমা বুঝতে পারল এলার কথা শুনে অমূল্য লজ্জা পেয়েছে। সসঙ্কোচে সে প্রতিমার দিকে তাকাল।

প্রতিমা প্রথমে বুঝতে পারে নি যে তার সামনে কথা বলতে চায় না এলা। যখন বুঝল তখন এলা অমূল্যকে নিয়ে বাইরে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

জীবনে প্রথম বার বোধ হয় প্রতিমা অমূল্যর ফিরে আসবার অধীর প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু এতক্ষণ ধরে কি কথা বলছে ওরা? প্রতিমার সামনে বলতে পারে না, এমন কি কথা এলার থাকতে পারে!

কৌতূহল দমন করতে না পেরে প্রতিমা বাইরে তাকিয়ে দেখল। ম্লান হেসে অমূল্য এলাকে কি যেন বোঝাচ্ছে আর মৃদু হেসে এলা ঘাড় নাড়ছে। ওদিকে আশে পাশের বাড়ি থেকে অনেকে ঝুঁকে পড়ে এলাকে দেখছে। পাড়ার ছেলেদের ভিড় জমতে আরম্ভ হয়েছে গাড়ির কাছে।

একটু পরে ফিরে এল অমূল্য। চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

তার মুখে। প্রতিমা যে তার প্রতীক্ষা করছে সেকথা সে বুঝতে পারল না। আবার খবরের কাগজ পড়ায় মন দিল।

প্রতিমা মনে মনে ভাবল, কাগজ পড়বার ভান করে আর কি হবে! মন বসবে না জানি। আবার বোধ হয় অনেক দিন পর এলার সঙ্গে দেখা হল। তাই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। এখন তো আর আগের মতো সুযোগ সুবিধা নেই। এখন প্রতিমা এসেছে এ বাড়িতে। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে গোপন কথা বলতে হয়। খেয়াল থাকে না এলার চেহারা পাড়ার সকলে চেনে। একটা কিছু ভেবে নিতে কতক্ষণ লাগে লোকের।

কিন্তু সেকথা কে ভাববে? কে ভাববে অমন অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে প্রতিমাকে অপমান করা হয়!

ভাত খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যাবার আগে অমূল্য চাকরকে বলল, আজ আমি বাড়িতে খাব না, নেমন্তন্ন আছে, ফিরতে রাত হবে,—

এর আগেও এমন কথা চাকরকে বলে গেছে অমূল্য। প্রতিমা শুনেও শুনতে পায় নি। সে গ্রাহ্য করে নি, অমূল্য দেরি করে ফিরবে কি শিগগির আসবে। যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজ অমূল্যর কথা শুনে সে সজাগ হয়ে উঠল। ঠিকই ধরেছে সে। পুরনো আলাপ ঝালাতে এসেছিল আজ সকালে এলা। তা আড়ালে ডেকে নিয়ে একা অমূল্যকে নেমন্তন্ন করা হল। ওদের রীতিনীতি বুঝতে পারে না প্রতিমা। এ কেমন ভদ্রতা? বাড়ি বয়ে এসে প্রতিমাকে অপমান করবার কোন মানে হয়? হোক প্রসিদ্ধ চিত্রতারকা, তাকে বাদ দিয়ে অমূল্যকে একা নেমন্তন্ন করবার কি অধিকার আছে তার!

আজ আর খাওয়া শেষ করে যথাসময়ে ঘুমোতে পারল না প্রতিমা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল। কখন অমূল্য ফিরবে। সে তো আগে জানত না এত গুণ তার স্বামীর। সুন্দরী অভিনেত্রীর বাড়িতে দামী সোফায় বসে গল্প করতে পেলে কে আর প্রতিমার কথা মনে করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে!

অমূল্য ফিরল অনেক দেরিতে। বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে তাকে। হবেই তো। আবার অনেক দিন পর প্রাণ খুলে গল্প হল। প্রতিমা ভাবল, কেন গর্ব বোধ করবে না অমূল্য। এলার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বললে ভিড় জমে যায়। অমূল্যর দিকে লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, এ তো আর প্রতিমার মতো গরীবের সাধারণ মেয়ে নয়!

মশারির মধ্যে থেকে প্রতিমা জিজ্ঞেস করল, কেমন নেমন্তন্ন খাওয়া হল?

চমকে উঠল অমূল্য। স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অবাক হয়ে সে বলল, এ কি! ঘুমোও নি যে এখনও?

আর কোন কথা বলতে পারল না প্রতিমা। ছি ছি! কি ভাবল তার স্বামী। কোন দিন অমূল্যর ব্যাপারে সে সামান্য কৌতূহল দেখায় নি, আজ তার এমন প্রশ্ন করা বিস্ময়ের কথা বৈকি!

অমূল্য আর কোন কথা বলল না সে-রাত্রে।

সাত আট দিন পর আবার এল এলা। সেদিনও বেশিক্ষণ বসল না। ঠিক তেমনি করে আবার অমূল্যকে বাইরে ডেকে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে চলে গেল। কি ভাবতে ভাবতে অমূল্য মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকল। প্রতিমাকে

তখনও সে-ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেল।

প্রতিমা বোকা নয়। সে সহজেই বুঝতে পারে কি কথা হয় ওদের তার আড়ালে। কিন্তু এতই যদি কথা জমে থাকে দুজনের তাহলে তাকে বিয়ে করবার কি দরকার ছিল অমূল্যর।

প্রতিমার মাথায় যেন আগুন ধরে যায়। তবু ঠাণ্ডা মাথায় শান্ত স্বরে সেই প্রথম বার স্বামী সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করল সে। অর্থাৎ অমূল্যকে না জিজ্ঞেস করে পারল না, এলা কি প্রয়োজনে এমন করে বাড়ি বয়ে আসে তার কাছে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ অমূল্য। কিছুতে প্রতিমার কাছে আসল কথা স্বীকার করল না।

কিছু না বললেও মানুষের মুখ দেখে মনের কথা বোঝবার ক্ষমতা আছে প্রতিমার। সাধে কি সে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

তার প্রশ্ন শুনে শুধু অবাক হয় নি অমূল্য, বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু সত্যি কথা বললে কি ক্ষতি হত তার। ওর স্বামী আমার বন্ধু—এসব আজেবাজে কথা বলে তাকে ভুলিয়ে রাখবার মানে কি! প্রতিমা কচি খুকি নয় যে তাকে অমূল্য যা বোঝাবে তাই বুঝবে। দেখা যাক, আর কতদিন তাকে এড়িয়ে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পাড়ার লোকের কৌতূহল সৃষ্টি করে ওরা গোপন কথা বলে।

প্রতিমার কথা কেমন করে ভুলে যায় অমূল্য? একটু টানও কি নেই লোকটার?

কয়েক দিন পর আবার এল এলা। সকালে নয়, সন্ধ্যে বেলা। অমূল্য তখনও অফিস থেকে ফেরে নি। স্নান সেরে প্রতিমা

সবে ঘরের আলো জ্বেলেছে। চাকর বাইরে গেছে, দরজা বোধ হয় খোলাই ছিল।

এলা সটান প্রতিমার সামনে এসে দাঁড়াল, এই যে কেমন আছেন ?

এলার আন্তরিকতায় মনে মনে রেগে গেলেও মুখে ভদ্রতা করে প্রতিমা বলল, ভাল। বসুন। আপনি কেমন আছেন ?

পাশের চেয়ারে বসে এলা বলল, শরীর ভাল নেই বিশেষ। দু এক দিনের মধ্যে বাইরে যাব ভাবছি—

উত্তরে কি বলতে হবে ভেবে না পেয়ে প্রতিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন ?

না না, ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে, অনেক কাজ আছে ; একটু চুপ করে থেকে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আবার বলল, অমূল্য বাবু নেই ?

প্রশ্ন শুনে মনে মনে প্রতিমা জ্বলে উঠল। কেন এসেছে সে কি বুঝতে পারে না ! প্রতিমা কেমন আছে সেকথা জানবার জন্যে তো ঘুম হচ্ছে না এলার। আগে আসত সকালে, এখন আসছে সন্ধ্যায়। এরপর আসতে আরম্ভ করবে রাত্তিরে।

এমনি করেই আরম্ভ হয়। এমনি করে সংসার ভেঙে চুরমার করে দেয় ওর মতো মেয়েরা। কিন্তু প্রতিমা কিছুতেই তা হতে দেবে না। দেখা যাক তার কাছ থেকে এলা অমূল্যকে ছিনিয়ে নিতে পারে কিনা। এলার সঙ্গে কোন রকম অভদ্রতা করবে না প্রতিমা। সে তার কে ? কিন্তু সে তার স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবে আজ। অগ্নি সাক্ষী করে মন্ত্র পড়ে যখন তাকে অমূল্য ঘরে এনেছে তখন এমন করে তুচ্ছ করবার কোন অধিকার নেই তার।

শান্ত স্বরে প্রতিমা বলল, উনি আপিস থেকে এখনও ফেরেন নি ?

কখন ফিরবেন ?

মিথ্যা কথা বলল প্রতিমা, বলে গেছেন আজ ফিরতে দেরি হবে।

কি ভেবে এলা বলল, দয়া করে একটা কথা বলবেন তাঁকে ?

নীরস স্বরে প্রতিমা বলল, বলুন ?

বলবেন আমি এসেছিলাম। যত রাত হোক আজ যেন উনি আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেন। আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকব—বিশেষ দরকার।

যন্ত্রের মতো প্রতিমা বলল, বলব।

আমি আসি আজ, আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম, আর একবার মনে করিয়ে দিল এলা, উনি এলেই বলবেন কিন্তু, প্রতিমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বেরিয়ে গেল।

রাগে শরীর কাঁপতে লাগল প্রতিমার। এত সাহস কোথা থেকে হয় এই সব মেয়েদের। নিলর্জ! স্ত্রীকে কেমন করে এরা বলতে পারে, যত রাতই হোক, তোমার স্বামীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কিন্তু পর মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল প্রতিমা। আজ এলাকে দোষ দিয়ে কি হবে ? সব দোষ তো তার। সে নিজেই তো দূরে সরিয়ে দিয়েছে অমূল্যকে। নির্দোষ মানুষকে অকারণে কষ্ট দিয়েছে। তা না হলে এলার সাধ্য কি এ বাড়িতে অমন করে যখন তখন এসে তার স্বামীর সঙ্গে গোপনে কথা বলে! সে কি করেছে অমূল্যর জন্যে ? তাকে মানুষ বলেও মনে করে নি। অমূল্য ভদ্রলোক তাই তার মতো স্ত্রীকে এত দিন বাড়িতে থাকতে দিয়েছে। অন্য কেউ হলে এমন স্বার্থপর মেয়েকে বাড়ি থেকে দূর করে দিত। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল প্রতিমার।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ি ফিরল অমূল্য।

ম্লান স্বরে মাথা নিচু করে প্রতিমা বলল, এত দেরি হল কেন ?

কেন বল তো ? আপিসে কাজ ছিল—

বস এখানে !

অবাক হয়ে অমূল্য বলল, কি ?

আমার ভীষণ অসুখ করবে—

প্রতিমার স্বর শুনে অমূল্য বুঝতে পারল সে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। তাই আরও অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কেন অসুখ করবে ? কি হয়েছে তোমার প্রতিমা ?

আমি আর বাঁচতে চাই না—

কেন ? কোনদিনও অমূল্যর কাছে প্রতিমা এমন ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে নি। আজ ওকে একেবারে অচেনা মনে হচ্ছে তার।

রুদ্ধস্বরে প্রতিমা বলল, আমার মরে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু এসব কথা তুমি কেন বলছ ? কি হয়েছে তোমার ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রতিমা বলল, আমি তোমার ওপর অবিচার করেছি। একদিনের জন্যেও তোমার সেবা করি নি—

অমূল্য বলল, কিন্তু তা নিয়ে আমি কোনদিনও কোন অভিযোগ করি নি।

বেশ জোর দিয়ে প্রতিমা বলল, এলা তো আপনার লোকের মতো তোমার কাছে আসে—

এলা ? নাম শুনে চমকে উঠল অমূল্য।

একটু আগে এসেছিল—

এলা এসেছিল ? ইস্ ! ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ল অমূল্য, কিছু বলল নাকি ?

হ্যাঁ—

কি—কি বলেছে সে ?

স্বামীর ব্যস্ততা লক্ষ করে ভাঙা গলায় প্রতিমা বলল, যত রাতই হোক না কেন, তোমাকে তার বাড়িতে আজ যেতে বলেছে—

প্রতিমার কথা শেষ হবার আগেই অমূল্য উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ ?

এলার ওখানে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব—

না, সমস্ত শক্তি দিয়ে অমূল্যর একটা হাত চেপে ধরে প্রতিমা বলল, আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছে তুমি দাও, কিন্তু এলার বাড়িতে তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না —আমি তোমাকে যেতে দেব না—

এতক্ষণ পর অমূল্যর মুখে হাসি ফুটল, কিন্তু এমন করে আমাকে কোনদিন তুমি তো কোন অনুরোধ জানাও নি ?

আমি মূর্খ। তাই একজন য়্যাকট্রেস আমাকেই বলে যায় আমার স্বামীকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে—

ছি ছি, এলা খুব ভাল মেয়ে, ওর সম্বন্ধে এসব কথা তুমি ভেব না।

আমি বোকা নই। কে ভাল আর কে মন্দ সেকথা বুঝতে আমার দেরি হয় না। যে যাই হোক, তুমি কিছুতেই এখন ওখানে যেতে পারবে না। আর ওকে বারণ করে দিতে হবে, ও যেন আর এ বাড়িতে না আসে—

অমূল্য হেসে বলল, তুমি যখন চাও না, নিশ্চয়ই আমি এলাকে আসতে বারণ করে দেব—

তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক তুমি রাখতে পারবে না।

রাখব না, আবার হাসল অমূল্য, কিন্তু আমি আজ না গেলে কাল সকালে এলা আবার এসে হাজির হবে, কি ভেবে সে বলল, তার চেয়ে আমি আজ যাই—

বাধা দিয়ে দৃঢ় স্বরে প্রতিমা বলল, না !

শোন, আমি আজ গিয়ে ওকে এখানে আসতে বারণ করে

আসি। গ্রীষ্মের রাত, সবে সাড়ে সাতটা বেজেছে। আমি যাব আর আসব।

কিন্তু গেলেই তুমি যে দেরি করবে।

না, বিশ্বাস কর, আমি এলার ওখানে পাঁচ মিনিটের বেশি থাকব না।

ঠিক ?

হ্যাঁ। তুমি আমার জন্যে এমনি করে অপেক্ষা করে থাক।

খুব তাড়াতাড়ি অমূল্য বেরিয়ে গেল।

অমূল্য এসেছে শুনে এলা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে বলল, আমি ভীষণ লজ্জিত অমূল্য বাবু, সামান্য টাকার জন্যে বারবার আপনাকে তাগাদা করি। চতুর্দিক থেকে এমন মুস্কিলে পড়েছি—

অমূল্য হেসে বলল, লজ্জা পাবার কথা আমার—আপনার নয়। কত দিন আপনার টাকাটা আটকে রাখলাম, এই যে—

একটা হাজার টাকার নোট এলার দিকে এগিয়ে দিয়ে অমূল্য আবার বলল, এক সঙ্গে দেব বলেই দেরি করলাম। বিয়ের পর আমাদের মতো লোকের পক্ষে হাজার টাকা জমানো কি সোজা কথা ? একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করল, রবি কই ?

কে জানে, স্বরে অবজ্ঞা প্রকাশ করে এলা বলল, আপনাদের অফিসের চাকরি কেন ছাড়ল ভগবান জানেন—

আর কথা না বাড়িয়ে অমূল্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ যাই, প্রতিমা অপেক্ষা করে আছে—

চমৎকার বউ হয়েছে কিন্তু আপনার, এলা বলল, ওঁকে দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন, হঠাৎ খুব দরকার পড়েছিল বলে সামান্য টাকার জন্যে আমি অমন তাগাদা করতে যেতাম। উনি যেন আমাকে অভদ্র মনে

না করেন। কথাটা আমারও কাউকে জানাবার ইচ্ছে ছিল না তাই অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজেই যেতাম—

না না, অভদ্র মনে করবে কেন? আমি বুঝিয়ে বলব, রাস্তায় নেমে অমূল্য মনে মনে হাসল।

কোনদিনও সে বোধ হয় প্রতিমার কাছে স্বীকার করতে পারবে না যে বিয়ের সময় বন্ধুর অভিনেত্রী স্ত্রীর কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার করেছিল আর তারই তাগাদা করতে সে আসত তার বাড়িতে।

৫ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৬

বুধবার সন্ধ্যা : কলিকাতা

॥ অন্তঃপুর ॥

প্রণালীর নাম জিব্রল্টর।

সমুদ্রের ওপর থেকে আস্তে আস্তে অন্ধকার সরে যায়। জলের অতল থেকে সূর্য লাফিয়ে ওঠে। দূরে অনেক আলোর বিন্দু কাঁপে। জাহাজ এগিয়ে আসে। কোনটা থামে। কোনটা থামে না। তবু বন্দরে কোলাহল জাগে।

অম্বরনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানে। দিনের মধ্যে অনেকবার তাকে বন্দরে আসতে হয়। সমুদ্রের শোভা সে দেখে না। এক রাশ বিস্ময় চোখে নিয়ে জাহাজের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সে দেখে নোঙর করবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছোট ছোট নৌকো জাহাজ ঘিরে ফেলে। কোনটাতে জুতো স্যুটকেশ, কোনটাতে স্কার্ফ চাদর রঙিন কাপড়, কোনটাতে সিগ্রেট পুতুল রকমারি খেলনা।

লোকগুলো নৌকো বাইতে বাইতে ওপরে তাকিয়ে জাহাজের যাত্রীদের উদ্দেশে চিৎকার করে, লুক্ ফাইন থিং—

লুক সার!

লুক ম্যাডেম্!

ভেরি চিপ!

নো কাস্টমস।

ফার্স্ট কেলাশ সিগ্রেট ওয়ান ফোর অনলি।

অর্থাৎ যে সিগ্রেট অন্য জায়গায় তিন টাকা বারো আনায় টিন কেনো, আমাদের কাছে তা এক টাকা চার আনায় পাবে।

শুধু সিগ্রেটের বেলায় কেন, জুতো স্যুটকেশ থেকে আরম্ভ করে অন্য সব জিনিসই এদের কাছে পাওয়া যায় অনেক কম দামে।

তবে মানুষের পছন্দ-অপছন্দের কথা আছে বৈকি। জিনিসটা পরীক্ষা না করে তো আর কেনা যায় না। দাম যতই সস্তা হোক না কেন।

জাহাজ থেকে যখন নেমে আসবার উপায় নেই দরিয়ার ওপর ভাসমান ছোট ছোট নৌকোগুলোর কাছে ক্রেতাদের, তখন ওদের কাছেই জিনিস পাঠাতে হয় মাঝিদের।

পাঠানোর ধরনটা একেবারে অন্য রকম। জিনিসটা মুখের ওপর যেন ছুঁড়ে মারা হয়। উপায় কি। ব্যবসা চালিয়ে যেতে হবে তো জলে স্থলে যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয় সেখানেই। আর প্রয়োজন হলে উপায়ও একটা বার হয়।

অনেক মোটা পুরু দড়ি থাকে নৌকোয়। শেষ প্রান্তটা গুটিয়ে গুটিয়ে বেশ ভারী করা। দোতলা কিংবা তেতলার ডেক থেকে ঝুঁকে পড়া যাত্রীর নির্দেশ মতো জিনিস বাঁধা হয় দড়িতে। তারপর শেষ প্রান্ত ছুঁড়ে মারা হয় ডেকের ওপর। তখন যাত্রী দড়ি টেনে টেনে নিচ থেকে জিনিস কাছে এনে পরীক্ষা করে। পছন্দ হলে দরাদরি চলে সাংঘাতিক রকম। দু পক্ষই সমান চিৎকার করে। দরে বনলে ওই দড়ির গুটোনো প্রান্তে দাম রেখে নামিয়ে দেয় নৌকোয়। না হলে জিনিস ফেরৎ।

এশিয়ার কোন বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই এমন হবে। গোলমাল চিৎকার দরাদরি হৈ হৈ। শুধু নৌকো যে লাগে জাহাজে তা নয়, নৌকো নিয়েও লাগে ওদের মধ্যে।

সরে যাও উল্লুক! আমি আগে এসেছি এখানে—

তেরা বাপকা পানি হায় রে?

কি বললি? লগি তুলে চোখ রাঙায় খেলনাওয়ালা।

জুতো স্যুটকেশওয়ালা ছোরা দেখায়। তারপর গালাগাল, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ।

এমন হয় প্রায়ই।

বলাই বাহুল্য যে নৌকোগুলো যথাসময় জাহাজ ঘিরে ফেলে সেগুলো ওদের নয়। নৌকো আর জিনিসের আসল মালিক হল অম্বরনাথ।

অম্বরনাথ জিব্রল্টরে এসে বাসা বেঁধেছে যুদ্ধের পর-পরই। সুন্দরী বউ ছিল সঙ্গে। কথা কম বলে অম্বরনাথ। আর যখন বলে তখন শুধু কাজের কথাই।

ভোর বেলা মোটা একটা খাতা খুলে সে বসে থাকে। দু একজন সহকারীও আছে তার। ভারতবর্ষেরই লোক। কাপড়ের ব্যবসা করতে এসে মোটা রকম লোকসান দিয়ে ঢুকে পড়েছে অম্বরের অফিসে।

অফিস আর কি, দোকানই বলা যায়। বাজারের মধ্যে একটা বড় ঘর। খেলনা কাপড় ব্যাগ স্যুটকেস আর সিগ্রেট তামাকে ঠাসা। স্থলেও ব্যবসা চালায় সে।

হাজির একবার হতেই হবে প্রত্যেককে সকাল বেলা। বিল্লু কাল্লু ইস্রায়েল ইসমাইল বারশা ভুলু আসবেই অম্বরনাথের কাছে আগের দিনের হিসেব-নিকেশের পালা মিটিয়ে দিতে। দরকার হলে নতুন জিনিসও নেবে।

এদিক ওদিক করবার উপায় নেই। বাকি রাখা চলে না। কড়া লোক অম্বরনাথ। ব্যবসা করতে বসে সে দয়ার সাগর হতে চায় না। পাকা ব্যবসায়ী বলেই নাম করতে চায়।

নাম করেছে। টাকাও করেছে অম্বরনাথ। এখানে আর যত

ভারতীয় ব্যবসায়ী আছে জিব্রল্টরে তাদের মধ্যে সে সব চেয়ে বড় লোক।

এখানকার আরও দু একজন ব্যবসায়ী যারা লোকসান দিয়ে মরেছে অম্বরনাথের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে, তারা মন্দ কথা বলতে ছাড়ে না তার সম্বন্ধে।

বলে, সে যে বড়লোক হয়েছে তার জন্যে কৃতিত্বের সব ভাগটাই প্রাপ্য নয় তার। প্রাপ্য নাকি তার সুন্দরী বউএর। অমন রূপসী বউ না থাকলে দেখা যেত অম্বরের মতো অকাট মূর্খ কেমন করে অধিকার পেত জিব্রল্টর প্রণালীর জলে কায়েমী ব্যবসা চালিয়ে যাবার। লোকটা আবার মানুষ নাকি।

বলে বলুক। যদিও কারুর সাধ্য নেই তার সামনে এসব কথা বলবার তবুও অম্বরনাথের কানে আসে সব। হিংসেয় ফেটে মরছে তার দেশের ব্যর্থ মানুষগুলো। এসব কথা ছড়িয়ে যদি একটু সান্ত্বনা পেতে চায়—পাক। হিংসুক মানুষের তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না অম্বর। তার অত সময় নেই। সেই সময়টুকু টাকা করবার নতুন ফন্দী আবিষ্কারের চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে আরও বেশি লাভ হবে তার নিজের।

টাকা করা সোজা ব্যাপার নাকি! জায়গাটার নাম তো আর বর্মা নয়। কাঠের ব্যবসা করে রাতারাতি ফেঁপে ওঠা যায় না এখানে।

খুব বেশি রকম না হলেও মোটামুটি ফেঁপেই উঠেছিল অম্বরনাথ যুদ্ধের আগে বর্মায় কাঠের ব্যবসা করে। যুদ্ধের ভারী ঝাপটায় গেল সব। তারপর অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে আবার নতুন জায়গায় এসে টাকা করেছে। বর্মার মতো অত বেশি টাকা না হলেও, কমই বা কি এমন।

সেই সব দিন অম্বরনাথের আজ আর ভাল মনে পড়ে না।

জিনিসপত্র সব ফেলে রানীর সঙ্গে হাঁটা পথ ধরে বর্মা ছেড়ে পালিয়ে আসা। যেখানে সেখানে ঘুরেছিল কুকুর-বেড়ালের মতো। ভাত নেই। আশ্রয় নেই।

অবশেষে তারা এসে পড়ল জিব্রল্টরে। হ্যাঁ, রানীর সাহায্য নিতে দ্বিধা করেনি অম্বর। ব্যবসা করতে নেমে নানা কথা ভেবে ইতস্তত করলে চলবে কেন। বন্দরের বড় বড় কর্মচারীরা রানীকে যে খুব বেশি পছন্দ করত সেকথা ঠিক। আর রানীও জানত তাকে বাদ দিয়ে এত তাড়াতাড়ি এমন করে গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হত না অম্বরের পক্ষে। রানীর রূপটা চোখে পড়বার মতো বটে। চোখে পড়েওছিল অনেকের। পড়ুক।

কিন্তু রানীরও চোখে পড়েছিল জীবনের অন্য আর এক রূপ। শুধু অম্বরের অবহেলা নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। বর্মা থেকে রাতের অন্ধকারে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসবার সময় দারিদ্র্য তাদের ঘিরে ধরেছিল সেকথা ঠিক, কিন্তু তবুও পরস্পরের প্রতি সমবেদনার মধুর ভাণ্ড ভরে উঠেছিল কানায় কানায়।

জিব্রল্টরে হারানো সম্পদ ফিরিয়ে আনবার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় জীবনটাও কেমন উগ্র হয়ে উঠল অম্বরনাথের। ফাটল ধরল সমবেদনায়। ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে রানীর ওপর আকর্ষণও গেল কমে। চোখ পড়ল নতুন মেয়েদের ওপর। যারা রানীর মতো লাজুক নয়, ঠাণ্ডা নয়। উষ্ণ আগ্রহে সক্রিয় হয়ে উঠল অম্বরনাথ।

হঠাৎ একদিন রানী নিজেকে আবিষ্কার করল বিকট অবমাননার মধ্যে। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠল না সে। ব্যর্থতার হিম আবেশে ভেঙেও পড়ল না। তার মতো মেয়ের গোটা জীবন ব্যর্থ করে দেয়ার সাধ্য নেই অম্বরনাথের মতো লোভী মানুষের।

অবশ্য অম্বরনাথ মোটামুটি একটা ভাল রকম ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিল রানীর। অনেক টাকা পয়সা দিয়ে ভারতবর্ষে তাকে তার

বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রানী তাকে দেয় নি সে-অবসর। বলেছিল, তার দয়া না নিয়েও এর চেয়ে ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার ক্ষমতা তার আছে।

তখন অম্বরনাথ ঠিক বোঝে নি কি ভেবে সেকথা রানী বলেছিল। বুঝল কিছুদিন পর যখন জাহাজের এক বড় কর্মচারীর সঙ্গে রানী চলে গেল তাকে ছেড়ে।

যায় যাক। টাকা থাকলে কোন অভাব থাকে নাকি মানুষের। এক এক রাতে এক একটি নতুন মেয়েকে বাড়িতে এনে রাখবে অম্বরনাথ। ভালই হয়েছে পুরনো ঠাণ্ডা নিস্তেজ স্ত্রী তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। জোর হেসে উঠতে চেয়েছিল অম্বর।

এখন যদিও অম্বরের আর কোনদিকে চোখ দেবার সময় নেই। চোখ রাখতে হয় তাকে শুধু তার লোক-লস্করের দিকে—যারা তার জিনিস নিয়ে নৌকো চালায়।

ব্যবসাটা আরও জাঁকিয়ে তুলতে হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি অম্বর ঠায় বসে থাকে হিসেবের খাতা খুলে। দুপুরের খাওয়া সেরে নেয় সামনেব দোকানে। বিকেলের চা-ও পাওয়া যায় সেখানে। খাওয়া দাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না অম্বর। কোন দিকেই তার লক্ষ নেই। শুধু অল্প সময়ের মধ্যে বেশি টাকা করে নিতে চায় সে। তা যেমন করেই হোক না কেন।

কথা কাটাকাটি থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। যেমন প্রায়ই হয়। নৌকো নিয়েই লেগেছিল ওদের দুজনের। তারপর একটু বেশি দূর এগিয়েছিল ওরা। ভুলু আর ইসমাইল।

দোষটা কার বলা যায় না। কিন্তু ভুলু ক্ষিপ্র গতিতে বাধা দেবার আগেই ইসমাইল ছোরা চালিয়েছিল তার বুকে। টলে পড়ে যায় ভুলু। পুলিশ ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করল ভুলুর। ধরল

ইসমাইলকেও। ওদের দুজনের নৌকোর দিকে কে আর নজর রাখবে তখন। জিনিসের হিসেব রাখবারও রইল না কেউ।

খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে অম্বরনাথ এল জাহাজ ঘাটে। নৌকো দুজনেরই ঠিক আছে বটে কিন্তু জিনিস ঠিক নেই। অনেক জিনিস উধাও হয়েছে। কে সরিয়ে নিয়েছে সুযোগ পেয়ে কে জানে।

বেশিক্ষণ সেখানে সময় নষ্ট করল না অম্বর। পুলিশ তাকে নিয়ে টানাটানি করলে অসুবিধা হবে। গোলমালে কতদিন দোকান বন্ধ রাখতে হবে ঠিক নেই। তার চেয়ে নির্বিকার ভাবে নৌকো দুটো নিয়ে সরে পড়া ভাল।

নৌকো যে অম্বরনাথের সেকথা অজানা নেই কারুর। বাধা দেবে না কেউ। দু একজন কর্মচারীর সাহায্যে সে নৌকো নিয়ে গেল ঘাটে।

জিনিসপত্র তছনছ হয়েছে বটে কিছু কিছু। তা আর কি করা যাবে। সময় হলে ইসমাইলকে বলা যাবে ভবিষ্যতে একটু সাবধান হয়ে চলতে। তারা যদি সব ভুলে কথায় কথায় এমন খুনোখুনি করে তাহলে জলের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হবে অম্বরনাথকে। সামান্য কারণে লোকসান হল অনেক। কত টাকার জিনিস আজ হারিয়েছে হিসেব না করলে শান্তি নেই তার।

দোকানে ফিরেই খাতা খুলে বসল অম্বর। ভুলু আর ইসমাইল কি কি জিনিস আজ সকালে নিয়েছিল তার হিসেব মেলাতে।

যারা সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে ছোরা বের করে খুনোখুনি করে তাদের মধ্যে আবার এত সহজে কেমন করে ভাব হয়ে যায় অম্বরনাথ ভেবে পায় না।

সকাল বেলা ইসমাইল এসেছিল। জামিনে খালাস পেয়েছে।

সে খবর দিল, ভুলুও ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। তবে বড় দুর্বল। বিছানা থেকে একেবারেই উঠতে পারে না। এখন নাকি খুব টাকার দরকার তার। ইসমাইলেরও টাকার দরকার। মামলা চুকে না যাওয়া অবধি নৌকো নিয়ে বেরুতে পারবে না সে। তাই অম্বরনাথের কাছ থেকে কিছু আগাম টাকা নিতে এসেছে। না পেলে খাওয়া জুটবে না তার।

সব শুনে অম্বরনাথ হাসে, টাকা কোথা থেকে দেব? তোমরা দুজন হাঙ্গামা করে আমার কত টাকা লোকসান করিয়ে দিয়েছ খেয়াল রাখ?

রাখি, ইসমাইল মাথা নেড়ে জানায়, আমরা বেইমান নই। ধাক্কাটা একটু সামলে উঠে আবার লাভ করিয়ে দেব সাহেব!

সে যখন দেবে তখন দেবে—টাকাও আমি দেব তখন। এখন লোকসান দিয়ে আমার মাথার ঠিক নেই।

ইসমাইল চলে গেলে অম্বরনাথ যেন বেঁচে যায়। যারা অতিরিক্ত চায় তাদের সঙ্গে তার কোনদিনও খাপ খায় না।

ইসমাইল দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাসে, কিছু টাকা চাই সাহেব। না হলে লোকটা বাঁচবে না। আর লোকটা না বাঁচলে—

লোকটা কে? তোমার কে হয়?

ভুলুয়ার কথা বলছি সাহেব—

অম্বরনাথ আশ্চর্য হয়ে বলে, ভুলু! এতই যদি দরদ তাহলে ছোরা মারলে কেন?

মেজাজ ঠিক ছিল না। কাজের সময় মেজাজ ঠিক থাকে না কি, বলেন? ভুলুয়া বে-তমিজের মতো চোটপাট করতে গেল আমার সঙ্গে?

তাহলে সে মরলে তোমার কি? এত মাথা ব্যথাই বা কেন? সে বাঁচবে না তো তুমি আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছ কেন?

আর কে আসবে বলেন ? বউটা ভুলুয়ার খাটিয়া ছেড়ে এক মিনিট ওঠে না। বিল্লু কাল্লু ইস্রায়েল বারশা পালা করে রাত জাগছে। টাকা তো কারুর কাছেই নাই ওদের।

চোখ বড় করে অম্বরনাথ ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। ব্যাপারটা বুঝতে যেন বেশ সময় লাগে তার। আকাশের নিচে কখন কি ঘটে কার সাধ্য বলে।

তখন কিন্তু টাকা দেয় না অম্বরনাথ। বলে, সন্ধ্যেবেলা সে যাবে ভুলু যেখানে থাকে সেখানে। তার যখন টাকার দরকার তখন তার সঙ্গে কথা বলে তাকেই টাকা দেবে। ইসমাইলকে টাকা দেবার কোন মানে হয় না অম্বরনাথের মতে।

ইসমাইল হাসে। বলে, তাই দেবেন সাহেব।

সে বোধহয় বুঝতে পারে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না অম্বর। এতদিন তার মাল আর নৌকো নিয়ে পাই পয়সার হিসেব দিয়ে এল প্রতিদিন, তবু কেন এত অবিশ্বাস সাহেবের! কিন্তু তর্ক না করে ইসমাইল বিদায় নেয়। আর একবার হাত জোড় করে মিনতি করে যায় ভুলুর ওখানে সন্ধ্যেবেলা যেতে। না গেলে মারা যেতে পারে সে।

ইসমাইলের এই অকৃত্রিম দরদের অর্থ তখনও পরিষ্কার হয় না অম্বরের কাছে। মোটা খাতা খুলে সে পকেট থেকে কলম টেনে নেয়।

সারাদিন পরিশ্রমের পর মাথাটা ঝিম ঝিম করে অম্বরনাথের। টাই ঢিলে করে মাথায় হাত দিয়ে ও আস্তে আস্তে সিগ্রেট টানে। জলের ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না কদিন থেকে। নৌকো ভাড়া নিতে আসে না ওরা ঠিক মতো। ভুলুকে নিয়ে বিব্রত আছে বোধ হয় সবাই।

ওদের বাদ দিয়ে ব্যবসা কেমন করে ভাল চলবে তার। মনে মনে ওদের বুদ্ধির তারিফ করতে পারে না সে। একটা লোককে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়বার কি আছে বাকি মানুষগুলোর। লেখাপড়া জানে না কিনা তাই দরদটা একটু বেশি। নিজের ক্ষতি করে পরের উপকার করে। টাকা না থাকলে যে কিছুই থাকে না সেকথা বুঝতে বেশ দেরি হবে ওদের। বুঝবে কিনা কে জানে।

রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। বন্দরের দিকে গাড়ি যাচ্ছে একটার পর একটা। কালো চুল ত্বলিয়ে একটা স্প্যানিশ মেয়ে চলে গেল একটু আগে।

চাঞ্চল্য জেগেছে বন্দরে। আর একটা জাহাজ লাগছে। অম্বরনাথের দোকান থেকে দেখা যায় সব। অসংখ্য আলো জ্বলছে বন্দরে। খালাসীরা পুরু দড়ি নিয়ে প্রস্তুত। সঙ্কেত পেলেই নোঙর করবে। সিগ্রেট টানতে টানতে অম্বরনাথ এক মনে নোঙর করবার দৃশ্য দেখছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই উঠে দাঁড়াল সে। সামান্য টাকাও সঙ্গে নিল। ভুলুকে দেখতে যেতে হবে। অম্বর এ সব গোলমালে জড়িয়ে পড়তে চায় না। তবু ওদের হাতে রাখা দরকার। হিংসুক ব্যবসায়ীরা তার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। এখন থেকে সতর্ক না হলে চলবে না। দেখা যাক শত্রুপক্ষ তাকে এঁটে উঠতে পারে কিনা।

ভুলুর বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে বেশ সময় লাগল অম্বরনাথের। তার দোকান থেকে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়।

বাড়ি বললে ভুল হবে। কাঠের ছোট একটা ঘর। সরু

গলি। আশেপাশে জীর্ণ পুরনো কাঠের সারি। বৈদ্যুতিক আলো আছে বটে ভুলুর ঘরে।

তাকে দেখেই সাড়া পড়ে গেল। ওরা তার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল মনে হয়। যারা নৌকো নিয়ে বার হয় তারা সকলেই বসে আছে ভুলুকে ঘিরে।

ভাঙা চেয়ার টেনে অম্বরনাথের সামনে এগিয়ে দিয়ে ইসমাইল বলল, বসেন সাহেব।

সে বসল। দেখল এপাশে ওপাশে। ওদের প্রত্যেককে। সব চেয়ে বেশি করে দেখল একটি বাঙালী বউকে। ভুলুর বউ নিশ্চয়ই। সব লজ্জা ভুলে লম্বা ঘোমটা টেনে স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। এর কথাই ইসমাইল বলেছিল তাকে সকালবেলা।

কেমন আছ ?

চোখ খুলে ভুলু হাসল। নিজেই উত্তর দিল সে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি কাজে বার হতে পারবে আবার। এখন কিছু টাকা আগাম পেলেই সে ঠিক মতো চিকিৎসা চালিয়ে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

বেশি কথা বলল না অম্বর। কোনদিনও বলে না। ভুলুর বউএর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। আজে বাজে বকে ভুলুর শরীরের অবস্থা খারাপ করা ঠিক নয় এখন।

তার নিজের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না কদিন থেকে। রোজ রাতে জ্বর হয়। মাথা বন বন করতে শুরু করে বিকেল থেকে। কিন্তু দোকান বন্ধ করে ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করবার মতো সময় নেই তার। ইচ্ছেও নেই। তেমন দরকার হলে নিজেই কয়েক মিনিটের জন্যে পাশের স্প্যানিশ ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ চেয়ে আনে। আজও এনেছে।

আজ বোধ হয় জ্বরটা একটু বেশি এসেছে অম্বরের। বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এদের সঙ্গে বসে থাকতেও খুব খারাপ লাগছে না তার।

ভারতবর্ষ থেকে ধাক্কা খেতে খেতে ওরাও হয়তো ছিটকে এসেছে অম্বরনাথের মতো জিব্রল্টরে। বউএর সোনাদানা বিক্রি করে নয়, হয়তো জাহাজের খালাসী হয়ে।

উঠে দাঁড়াল অম্বরনাথ। তার মতো মানুষের এভাবে এদের মধ্যে বেশিক্ষণ বসে থাকা ভাল দেখায় না। হয় তো ওদেরও অসুবিধা হচ্ছে।

ওদের সকলের সামনেই ভুলুর বউকে লক্ষ করে বলল অম্বর, এই যে কিছু টাকা রেখে গেলাম—

ভুলুর বউ কোন কথা বলল না। চোখ তুলে তাকাল না তার দিকে। যেমন বসেছিল তেমন করে ঠায় বসে রইল।

রাস্তায় নামল অম্বরনাথ। মোড় অবধি এগিয়ে দিল ওরা তাকে। তার শরীর খারাপের কথা জানতে পারলে হয়তো বাড়ি অবধি পৌঁছে দিত। কিন্তু সে কিছু বলল না ওদের। ফিরে যেতে বলল শুধু।

সামনের টানা পথ ধরে অম্বরনাথ চলতে লাগল। অল্প অল্প শীতের হাওয়া দিচ্ছে। কিছু দূর এসে সে বাজারের মধ্যে পড়ল। এপাশে ওপাশে নানা জিনিসের দোকান। তখনও ক্রেতাদের কোলাহল থেমে যায় নি। কোন দিকে তাকাল না সে। মাথা নিচু করে দুই হাত পিছনে দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

বাড়ি বেশি দূরে নয়।

কাঠের সিঁড়ি। তেতলার ফ্ল্যাট। কারুর সাড়া শব্দ

পাওয়া যাচ্ছে না। গ্লোরিয়া কি আসে নি এখনও? জ্বর বেড়েছে। শরীর টলছে।

দরজা খুলল অম্বরনাথ। আলো জ্বলছে। রোজকার মতো গ্লোরিয়া এসে বসে আছে সেজে গুজে। আর কেউ নেই কোথাও। থাকে না কোনদিন।

স্পেইনে বাড়ি গ্লোরিয়ার। অম্বরনাথ ডাকলে সে আসে। যাবার সময় পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যায়। সুন্দর স্বাস্থ্য। ঝকমকে রূপ। টাকা যাদের নেই তাদের দেবারও কিছু নেই গ্লোরিয়ার।

অম্বরনাথের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসে অনেকক্ষণ। মদিরা যেন রাঙা ঠোঁটের ফাঁক থেকে উপচে পড়ে। জ্বলন্ত যৌবনের ভারে দেহ গর্বিত গ্লোরিয়ার। তাই তাকে আজকাল প্রায় রোজই আসতে বলে অম্বরনাথ।

ঘরে ঢুকতেই ছোট মেয়ের মতো অম্বরনাথের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে গ্লোরিয়া। তারপর সভয়ে দূরে সরে গিয়ে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তোমার জ্বর হয়েছে। কি অসুখ? ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে? বিবর্ণ দেখায় গ্লোরিয়ার মুখ।

সব কথার উত্তর দেয় না অম্বরনাথ। কোনদিকে না তাকিয়ে ঝপ করে খাটে শুয়ে পড়ে। আলোটা চোখে লাগছে। সে গ্লোরিয়াকে ক্লান্ত স্বরে শুধু আলো নিভিয়ে দিতে বলে। তারপর কাছে ডাকে তাকে।

কি? পুতুলের মতো গ্লোরিয়া বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।

আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে থাক গ্লোরিয়া। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে একেবারে, সমস্ত শক্তি দিয়ে অম্বরনাথ গ্লোরিয়াকে টেনে খাটের ওপর বসায়।

মাতালকে ভয় করে না গ্লোরিয়া। বদমাইসকেও নয়। শুধু

রোগকে তার সাংঘাতিক রকম ভয়। রুগিকে আরও বেশি। তবু পুরনো লোক বলে সে কথা শোনে অম্বরনাথের। যন্ত্রের মতো তার মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে অন্ধকারে বসে থাকে চুপচাপ।

কিন্তু স্বস্তি পায় না অম্বরনাথ। উসখুস করে। ছটফট করে। মাথা তুলে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে গ্লোরিয়ার দিকে।

একটু পরে করুণ স্বরে বলে, আমার মাথাটা কোলের ওপর তুমি আরও ভাল করে রাখতে পার না গ্লোরিয়া?

তাকে আদর করে শক্ত করে মাথা চেপে ধরে গ্লোরিয়া বলে, কেন পারব না? এই তো। এমনি করে?

কিছুক্ষণ চুপ করে অম্বরনাথ শুয়ে থাকে। কি যেন একটা অসুবিধা হচ্ছে। তৃপ্তি হচ্ছে না ঠিক। গ্লোরিয়ার কোলের ওপর মাথা ঘষতে থাকে সে।

হচ্ছে না গ্লোরিয়া। তুমি পারছ না। অমন করে নয়। আরও ভাল করে—মাথা তুলে তাকে বোঝাতে প্রাণপণ চেষ্টা করে অম্বরনাথ।

গ্লোরিয়া হেসে ওঠে, ডাক্তার ডাক। ফোন করব? আর একটু পরেই তুমি কিন্তু ভুল বকতে আরম্ভ করবে বলে দিলাম।

আবার মাথা নামায় অম্বরনাথ। গ্লোরিয়ার কোলের ওপর নয়, বালিশের ওপর। অনেকক্ষণ কথা বলে না আর। শুধু ঘণ্টা খানেক পর চলে যেতে বলে গ্লোরিয়াকে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় গ্লোরিয়া। কিন্তু চলে যায় না। কি যেন বলতে চায় অম্বরনাথকে। ইতস্তত করে।

বলতে হয় না শেষ অবধি। অম্বরনাথ পকেট থেকে নিজেই টাকা বের করে দেয়।

ধন্যবাদ জানিয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকারে পা টিপে টিপে সাবধানে গ্লোরিয়া বেরিয়ে যায়।

ঘরের আলো জ্বালায় না অম্বরনাথ। অন্ধকারেই শুয়ে থাকে খাটের ওপর। তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু জল গড়িয়ে নেবার এতটুকু ইচ্ছে নেই।

আরও টাকা ছিল পকেটে। পাশ ফিরতেই পড়ে গেল মাটিতে। সেগুলি তুলে নিয়ে গুণে দেখবার কোন উৎসাহ নেই অম্বরনাথের।

১৮ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৭

বুধবার সন্ধ্যা : কলিকাতা

